বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান

মানব প্রকৃতির জৈববিজ্ঞানীয় ভাবনা

অভিজিৎ রায়

মুক্তমনা ই- বুক
© Mukto-Mona

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান

মানব প্রকৃতির জৈববিজ্ঞানীয় ভাবনা

অভিজিৎ রায়

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান – মনের নতুন বিজ্ঞান :

লেখাটা শুরু করতে গিয়ে ছোট বেলায় শোনা একটা ‘বড়দের জোক্’ মানে প্রাপ্তবয়স্ক কৌতুক মনে পড়ল। কৌতুকটা এইরকম।

এক আধ- পাগলা ব্যাটা (ধরা যাক তার নাম মন্টু মিয়া) সারাদিন পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গুলতি দিয়ে জানালার কাঁচ ভাঙ্গত। এইটাই তার নেশা। কিন্তু বাপ, তুই নেশা করবি কর – তোর নেশার চোটে তো পাড়া- পড়শীর ঘুম হারাম। আর তা হবে নাই বা কেন! কাশেম সাহেব হয়তো ভরপেট খেয়ে দেয়ে টিভির সামনে বসেছেন, কিংবা হয়ত বিছানায় যাওয়ার পায়তারা করছেন, ওমনি দেখা গেল হরাম করে বেডরুমের কাঁচ ভেঙ্গে পড়লো। শান্ত কখনো বা সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সারার নাম করে বাবা- মার কাছ থেকে লুকিয়ে চাপিয়ে বাথরুমে গিয়ে কমোডে উপবেশনপূর্বক একটা বিড়ি ধরিয়ে একখান সুখটান দেবার উপক্রম করেছে – ওমনি গুলতির চোটে বাথরুমের কাঁচ ছত্রখান। নরেন্দ্রবাবু সকালে উঠে এক রৌদ্রস্নাত দিন দেখে ‘আজি এ প্রভাতে রবির কর...’ কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে করতে জানালা দিয়ে চাঁদমুখখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন, ওমনি এক ক্ষুদ্র ইস্টকখন্ড আসিয়া জানালা তো ভাঙিলোই, তদুপরি কপালখানিও বেঢপ আকৃতিতে ফুলিয়া উঠিলো।

কাহাতক আর পারা যায়। পাড়া পড়শীরা একদিন জোট বেঁধে শলাপরামর্শ করে মন্টু মিয়াকে বগলদাবা করে শহরের পাশের পাগলা গারদে দিয়ে আসলো।

সে এক হিসেবে ভালই হল। এখন আর বলা নেই কওয়া নেই – হঠাৎ করে কারো জানালার কাঁচ ভেঙ্গে পড়ে না। কাশেম সাহেব ভরপেট খেয়ে টিভির সামনে বসতে পারেন, শান্ত বাবাজি হাগনকুঠিতে গিয়ে নিবিষ্ট মনে গিয়ে বিড়ি টানতে পারে, আর নরেন্দ্রবাবুও রবিঠাকুরের কবিতা শেষ করে জীবনানন্দ দাসেও সেঁদিয়ে যেতে পারেন, কোন রকমের বাধা বিপত্তি ছাড়াই। জীবন জীবনের মত চলতে থাকে নিরপদ্রুপে।

আর অন্য দিকে মন্টু মিয়ার চিকিৎসাও ভালই চলছে। প্রতিদিন নিয়ম করে তাকে ঔষধ পথ্য খাওয়ানো হচ্ছে, রেগুলার সাইকো থেরাপি দেওয়া হচ্ছে, সমাজ জীবন নিয়ে এন্তার জ্ঞানও দেয়া হচ্ছে। মানুষ সম্পর্কে আর সমাজ সম্পর্কে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা হচ্ছে। আর মন্টু মিয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন দেশের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডঃ আজিম। তো এই উন্নত চিকিৎসা আর পরিবেশ পেয়ে মন্টু মিয়ার মনও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে উঠলো। এখন আর জানালার কাঁচ দেখলেই মন্টু মিয়ার হাত আগের মত নিশপিশ করে না। জব্দ করা গুলতির জন্য মন কেমন কেমন করে উঠে না। নিয়ম করে খায় দায়, বই পড়ে, ব্যায়াম করে আর সমাজ আর জীবন নিয়ে উচ্চমার্গীয় চিন্তা করে। অসুস্থতার কোন লক্ষণই আর মন্টু মিয়ার মধ্যে নেই! দিন, যায়, মাস যায়, বছর যায় ...

বহুদিন ধরে চিকিৎসার পর একদিন সুবে সাদিকে ডাক্তার সাহেব মন্টুমিয়ার কেবিনে এসে বললেন,

- ‘মন্টু মিয়া, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ’।

- ‘তাই ? এইটা তো খুবই ভাল সংবাদ দিলেন স্যার। আমি তো ভাবতেছিলাম এই পাগলা গারদ থেকে কোনদিন ছাড়াই পামু না আর’। মন্টু মিয়ার চোখে বিস্ময়।

- ‘কি যে বলো! আমাদের চিকিৎসার একটা ফল থাকবে না!’ - ডাক্তার সাহেবের ভরাট গলায় একধরনের আত্মপ্রসাদের ছাপ।

- ‘তা তো বটেই। আপনাগো অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আপনারা সবাই মিল্লা আমার জন্য যা করলেন...’

- ‘না না কি যে বলেন। আপনার নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া কি আর এ অসাধ্য সম্ভব হত নাকি!’ বিনয়ের অবতার সেজে গেলেন ডাক্তার সাহেব। তারপর হাতের স্টেটসকোপ দিয়ে নাড়ী দেখলেন, রক্তের চাপ পেলেন স্বাভাবিক মাত্রায়। জিব বের করিয়ে চোখের পাতা টেনে ধরে নীচে উপর করলেন – কোন অস্বাভাবিকতাই পেলেন না। আরো কিছু ছোট খাট পরীক্ষা সেরে নিলেন। একজন স্বাভাবিক মানুষের যা যা লক্ষণ পাওয়া উচিৎ তাই পেলেন ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার আজীম বুঝলেন তার চিকিৎসায় মন্টু এখন পুরোপুরি সুস্থ। অযথা আর হাসপাতালে আটকে রাখার কোন মানে হয় না। তাকে রিলিজ করে দেওয়ার যাবাতীয় কাগজ পত্র হাতে নিলেন সই করবেন বলে। এই কাজটা একদমই ভাল লাগে না ডঃ আজিমের। সামান্য একটা রিলিজ, অথচ হাজারটা কগজপত্র, হাজার জায়গায় সই। কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়ে একটা একটা করে সই- এর দায়িত্ব

সেড়ে নিচ্ছেন ডাক্তার সাহেব। ফাঁকে ফাঁকে মন্টু মিয়ার সাথে কথোপকথন চালাচ্ছেন, যাতে যতদূর সম্ভব বিরক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

- তা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কি করবে মন্টু মিয়া? সোজা বাসায় চলে যাবে?

- না ডাক্তার সাব। ভাবতেছি সামনের ওই নিষাদ হোটেলটায় আগে যামু।

- হোটেলে? কেন? ভাল করে খাওয়া দাওয়া করবে বুঝি? তা করতেই পার। হাসপাতালের ঘাষ পাতা খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে নিশ্চয়।

- হোটেলটায় নাকি মদ টদ আর সাথে আরো কিছু জিনিস পাওয়া যায় সস্তায়। ভাবতেছি অনেকদিন ...

- হ্যা হ্যা তা তো বটেই। আরে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন। ফুর্তি করার এটাই তো বয়স। হ্যা, ওখানে শুধু মদই পাওয়া যায় না, সাথে নাকি সুন্দর সুন্দর মেয়েও পাওয়া যায়... মানে এই আমি শুনেছি আর কি ...
(ডঃ আজীম যে সে সব উদ্ভিন্নযৌবনা মধুমক্ষিকার লোভে প্রায়শঃই বাসার নাম করে নিষাদে সেঁদিয়ে যান, আর দীর্ঘ সময় পরে মাঝ রাতে বাসায় গিয়ে বউকে আলিঙ্গন করে বলেন ...আজকেও ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, বুঝলে এত কাজ থাকে... এই ব্যাপারটা এক্ষণে মন্টু মিয়ার কাছ হইতে চাপিয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলেন ডঃ আজীম)।

- 'হ স্যার ওগো জিনিস ভালা। আমি জানি'।

- 'তো এতদিন পর এরকম একটা চান্স... নিশ্চয় অনেক আমোদ ফুর্তি করবে'।

- 'হ স্যার। লটের সব থেইক্যা সুন্দর মাইয়াডারে ভাড়া করুম। লগে এক বোতল কেরু'।

- 'বাহ তারপর?' ডাক্তার সই করার কথা ভুলে মন্টু মিয়ের দিকে চাইলেন। কেরুর প্রতি ডঃ আজীমের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ না থাকলেও (তিনি আবার বিদেশি মদ ছাড়া কিছু মুখে দেন না), নারীদেহের প্রতি তার অন্তহীন আকর্ষণ। মন্টু মিয়া হোটেলে গিয়ে কি করবেন, তা ভেবেই তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

- 'তারপর আর কি! একটা রুম বুক দিমু। টেকা পয়সা যা আছে তাতে চইলা যাইব'।

- ‘টাকা পয়সা যে তোমার আছে তা ত জানি। কিন্তু তুমি রুমে গিয়ে কি করবে?’ ডাক্তার সাহেবের আর তর সয় না।

- ‘রুমে গিয়া দরজাটা ভাল মত লক করমু আগে। তারপর মাইয়াডারে বিছানায় বহাইয়া কেরুর বোতল খুইলা দিমু চুমুক। তারপর আস্তেধীরে মাইয়াডার দিকে আগামু...

- ‘তারপর, তারপর?’ ডাক্তার সাহেবের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠছে।

- ‘তারপর স্যার ... মাইয়াডার কাপড় আস্তে ধীরে খুলতে শুরু করমু। তারপর ...’

- ‘তারপর?’ ডাক্তার সাহেব উত্তেজনায় পারলে একেবারে দাঁড়িয়ে যান।

- তারপর ব্রা টা খুইলা লমু ...

- ‘হ্যা, তারপর? তারপর কি করবে?’ ডঃ আজীম এবারে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছেন একেবারে।

- ‘তারপর স্যার, ওই ব্রাটার ইলস্টিকটারে গুলতি বানায়া হোটেলের জানালার সমস্ত কাঁচ ভাঙ্গুম!'

- ‘কী!!!!’ ডঃ আজীম মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

*** ***

ছোটবেলায় শোনা এই ‘বড়দের’ জোকটা ‘ফালতু’ মনে হলেও এর মর্মার্থ কিন্তু ব্যাপক। এতে আমাদের মানব মনের এক অন্তহীন প্রকৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বড়দের ‘ঈশপের গল্পে’র মর্মার্থ হল - কারো কারো মাথার ক্যারা এমনই যে, যত চেষ্টাই করা হোক না কেন সেই ক্যারা কোন রকমেই বের করে ফেলা যায় না । যত সাইকোথেরাপিই দেয়া হোক না কেন, দেখা যায় আবার সুযোগ পেলেই এবাউট টার্ন করে রোগী। আমি 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ' * নামে একটি সিরিজ লিখেছিলাম, সেখানে বহু দৃষ্টান্ত

* সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ? , মুক্তমনা ওয়েব সাইইট, লিঙ্ক : http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/shomokamita1.htm

হাজির করে দেখিয়েছিলাম যে, সমকামিতার ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ পরিবেশ নির্ভর নয়, বরং 'বায়োলজিকালি হার্ডওয়্যার্ড'। একটা সময় ছিলো যখন, সমকামিতাকে ঢালাওভাবে মনোরোগ বা বিকৃতি বলে ভাবা হত। ভাবা হত সমাকামিতা বোধ হয় কিছু বখে যাওয়া মানুষের বেলাল্লাপনা ছাড়া আর কিছু নয়। আজকের দিনে সেই ধারণা (অন্ততঃ পশ্চিমে) অনেকটাই পাল্টেছে।এ প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত।

মন্টু মিয়ার পাগলামো কিংবা সমকামিতাই কি 'ক্যারা মাথার' কেবল একমাত্র উদাহরণ? না তা মনে করা ভুল হবে। আমাদের চারপাশে কি আরো উদাহরণ চোখ মেললেই আমরা মানব প্রকৃতির এ ধরনের আরো মজার মজার উদাহরণ দেখতে পাব। একই রকম কিংবা প্রায় একই রকম পরিবেশ দেয়ার পরও অভিভাবকেরা লক্ষ্য করেন - তাদের কোন বাচ্চা হয় মেধাবী, অন্যটা একটু শ্লথ, কেউ বা আবার অস্থির, কেউ বা চাপা স্বভাবের, কেউ বা কোমল কেউ বা হয় খুব ডানপিটে। কেউ বা স্কুলের লেকচার থেকে চট পট অংকের সমস্যাগুলো বুঝে ফেলে, কেউ বা এ ধরণের সমস্যা দেখলেই পালিয়ে বাঁচে, কিংবা মাস্টারের বেতের বাড়ি খেয়ে বাসায় ফেরে। ছোট বেলা থেকেই কেউ পিয়ানোতে খুব দক্ষ হয়ে উঠে, কেউ বা রয়ে যায় তাল কানা। কেউ বা খেলাধূলায় হয় মহা চৌকষ, কারো বা ব্যাটে বল লাগতেই চায় না। কেউ ছোটবেলা থেকেই গল্প- কবিতা লেখায় খুব পারদর্শি হয়ে উঠে, তার কেউ সাহিত্য শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলেই দাঁত খুলে আসে কিংবা একটা চার লাইনের কবিতা লিখতে গেলেই কলম ভেঙ্গে পড়ে। এ ধরনের ব্যাপার স্যাপারের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত।

কাজেই, আমরা কিছু উদাহরণ পেলাম যেগুলো হয়ত অনেকাংশেই পরিবেশ নির্ভর নয়। অন্ততঃ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে আমরা সেগুলোর প্রকৃতি রাতারাতি বদলে দিতে পারি না।আইনস্টাইনকে শিশু বয়সে আর্জেন্টিনা বা ব্রাজিলে বড় করলেই কি তিনি ম্যারাডোনা বা পেলে হয়ে উঠতে পারতেন? তা কিন্তু হলফ বলা যাবে না। তার মানে ভাল বা ' উপযুক্ত' পরিবেশ দেয়ার পরও বাঞ্ছিত ফলাফল আমরা পাই না বহু ক্ষেত্রেই। তখন কপাল চাপড়ানোই সার হয়।কিন্তু তার মানে কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, জীবন গঠনে পরিবেশের কোন প্রভাব নেই। অবশ্যই আছে। জীবন গঠনে পরিবেশের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, সেটা তো আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি। সে জন্যই প্রত্যেক পিতামাতা তার

সন্তানকে একটা ভাল পরিবেশ দিয়ে বড় করতে চান। শিশুর মানসপটে পরিবেশের প্রভাব আছে বলেই ভাল একটা পরিবেশ প্রদানের জন্য কিংবা ভাল একটা স্কুলে বাচ্চাকে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকেরা অহর্নিশি চিন্তিত থাকেন। তারপরও কি তারা সবসময় প্রত্যাশিত ফল পান? মুনির ঘরে কি শনি জন্মায় না? কিংবা আলিমের ঘরে জালিম? জন্মায় জন্মায়। এই আমার উদাহরণটাই ধরুন। আমার মা ছোটবেলা থেকে কত করে চাইলো তার ছেলেটার যেন ধর্ম কর্মে মতি থাকে, সবার সাথে যেন ভাল ব্যবহার করি, কারো সাথে যেন ঝগড়া ফ্যাসাদে না জড়াই। তা আর হোল কই! ধর্ম কর্ম আর আমার ধাতে সইলো না। মুনাফেকের খাতায় অচীরেই নাম উঠে গেলো আমার। সাত বছর বয়সে আমি ঘোষণা দিয়ে বললাম – 'মন্দিরের প্রসাদ যেন আমাকে না খাওয়ান হয় কখখনো'। আমাদের পাড়ার (মা- বাবার দৃষ্টিতে) সবচেয়ে অপছন্দের আর 'বখে জাওয়া' ছেলেটার সাথে মিশতে শুরু করে দিলাম। আমার মা নীরবে চোখের জল ফেলেন- "কী কুক্ষণে যে এইটারে পেটে ধরেছিলাম!" অথচ এমন কি হবার কথা ছিলো? ভাল পরিবেশের কোন অভাব ছিলো না আমার ...

পাঠকদের মাথায় নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করেছে – পরিবেশই যদি মানব প্রকৃতি গঠনের একমাত্র নিয়ামক না হয়ে থাকে, তাহলে আর বাকী থাকে কি? বাকী থাকে একটা খুব বড় জিনিস। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, মানব প্রকৃতি গঠনে পরিবেশের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে আরেকটা জিনিসের প্রভাব। সেটা হচ্ছে বংশানু বা 'জিন'। মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে 'জিন'কে নিয়ে আসায় অনেকের চোখই হয়তো কপালে উঠে যাবে। ভুরুও কুঁচকে যেতে পারে কারো কারো। তবে আমি এ প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করব যে, 'পরিবেশ' এবং 'জিন' - মানব প্রকৃতি গঠনে কোনটার প্রভাবই কোনটার চেয়ে কম নয়। আমরা প্রায়শই এক সন্তানদের দেখিয়ে বলি – 'ছেলেটা বাপের মতই বদরাগী হয়েছে', কিংবা বলি 'মেয়ে হয়েছে মার মতই সুন্দরী। চোখগুলো দেখেছ – কি রকম টানা টানা?' এগুলো কিন্তু আমরা এমনি এমনি বলি না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলো বলি, আর সেজন্যই এই উপমাগুলো আমাদের সংস্কৃতিতে এমনিভাবে মিশে গেছে। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য নয়, আবেগ, অনুরাগ, হিংসাত্মক কিংবা বদরাগী মনোভাব এমনকি ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি পর্যন্ত আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি 'জেনেটিক তথ্য' হিসবে আমাদের অজান্তেই। বাবার হৃদরোগের উপসর্গ থাকলে ছেলেকেও একটু বাড়তি সচেতন হতে পরামর্শ দেন আজকের ডাক্তারেরা। কার্ব আর রেড মিট ছেড়ে দিতে বলেন। পরিবারে কারো ডায়াবেটিস থাকলে কিংবা কাছের কোন আত্মীয়রের দেহে এ রোগ বাসা বেধে থাকলে অন্যান্যরাও নিয়মিত 'সুগার চেক' করা শুরু করে দেন। এগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। শারীরিক গঠন কিংবা রোগ- বালাইয়ের ক্ষেত্রে তাও না হয় মানা যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠনে 'জিন'-এর প্রভাব থাকতে পারে, এ ব্যাপারটা মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি ছিলো, এখনো

আছে বহুজনেরই। আর আপত্তি আছে বলেই আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে পরিস্কার দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছি - জীববিজ্ঞান আর সমাজবিজ্ঞান নামের অভিধায়। প্রাণিদেহের এবং সর্বোপরি মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মিউটেশন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করবেন জীববিজ্ঞানীরা, আর সমাজ সংস্কৃতি আর মানুষের মন নিয়ে গবেষণা করবেন সমাজবিজ্ঞানীরা কিংবা মনোবিজ্ঞানীরা। এ যেন দুই সতন্ত্র বলয়। জীববিজ্ঞানের আহৃত গবেষণা সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নিরব থাকবেন। আবার সমাজিক বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সামাজিক গবেষণা সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীরা উদাসীন থাকবেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম হয়ে গিয়েছে যেন। কিন্তু এই বিভেদ কি যৌক্তিক? এই দুই বলয়ের মধ্যে কি কোনই সম্পর্ক নেই? আধুনিক চিন্তাবিদরা কিন্তু বলেন, আছে। খুব ভালভাবেই সম্পর্ক আছে। আসলে সংস্কৃতি বলি, কৃষ্টি বলি, দর্শন বলি, কিংবা সাহিত্য – এগুলো কিন্তু মানব মনের সম্মিলিত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। আবার মানব মন কিন্তু মানব মস্তিস্কেরই (Human brain) অভিব্যক্তি, যেটাকে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার ‘হাও মাইন্ড ওয়ার্ক্স’ বইয়ে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে – ‘Mind is what the brain does’। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, দীর্ঘকালের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াতেই তৈরি হয়েছে মানব বংশানু যা আবার মস্তিস্কের গঠনের অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক। কাজেই একধরনের সম্পর্ক কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আমরা চাইলেও আর সামাজিক আচার ব্যবহার কিংবা মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে জীববিজ্ঞানকে আর সমাজবিজ্ঞান থেকে আজকে আলাদা করে রাখতে পারি না। এ ব্যাপারটাই স্পষ্ট করেছেন জন ব্রকম্যান তার সাম্প্রতিক ‘সায়ন্স এট এজ’ (২০০৮) বইয়ের ভূমিকায় –

> Connection do exist: our arts, our philosophies, our literature are the product of human minds interacting with one another, and the human mind is a product of human brain, which is organized in part by the human genome and has evolved by the physical process of evolution.

মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষনে জিন বা বাংশানুকে গোনায় ধরা উচিত – এ ব্যাপারটি প্রথম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন এডওয়ার্ড ও উইলসন তার বিখ্যাত ‘Sociobiology’ (১৯৭৫) নামক বিখ্যাত পুস্তকে। সে সময় উইলসনের গবেষণার বিষয় ছিলো পিঁপড়ে এবং পিঁপড়েদের সমাজ। পিঁপড়েদের চালচলন গতিবিধি এবং সমাজব্যবস্থা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভদ্রলোক রিসার্চ করছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি এ নিয়ে একটি সুন্দর একাডেমিক বইও লিখেছিলেন ‘দ্য ইনসেক্ট সোসাইটি’ নামে। ১৯৭৫ সালের ‘সোশিওবায়োলজি’ বইটিতেও তিনি পিঁপড়েদের আকর্ষণীয় জীবন যাপন আর সমাজের নানা রকমের গতিবিধিই মূলতঃ ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি যদি সেখানেই থেমে যেতেন, তবে কোন সমস্যা ছিলো না। কিন্তু তিনি সেখানে থেমে না গিয়ে শেষ অধ্যায়ে তার ধ্যান ধারণা একেবারে মানবসমাজ পর্যন্ত নিয়ে যান। পরে সেই ধারণাকে উইলসন আরো বিস্তৃত

করেন তার পরবর্তী বই 'On Human Nature' (১৯৭৮) - এ। তিনি বলেন আজকে আমরা যাদের আধুনিক মানুষ নামে অভিহিত করি, সেই হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতিটির মূল মানসপটের বির্নিমান আসলে ঘটেছিলো অনেক আগে - যখন তারা বনে জঙ্গলে শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়ে জীবন যাপন করত। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সেই আদি স্বভাবের অনেক কিছুই কিছুই এখনো আমরা আমাদের স্বভাবচরিত্রে বহন করি - যেমন বিপদে পড়লে ভয় পাওয়া, দল বেধে বিপদ মোকাবেলা করা, অন্য জাতি/ গোত্রের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, সবার আগে নিজের পরিবারের বা গোত্রের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া ইত্যাদি। এগুলোর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে বর্তমান সভ্যতার জটিল সাংস্কৃতিক উপাদান। এই জিন এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের সুষম মিশ্রনেই গড়ে উঠে মানব প্রকৃতি, যাকে উইলসন তার বইয়ে চিহ্নিত করেন ' জিন- কালচার কোএভুলুশন' (Gene-culture coevolution) নামে।

যখন অধ্যাপক উইলসনের বইটি প্রকাশিত হয়, তা একাডেমিয়ায় তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা অধ্যাপক উইলসনের কাজকে দেখেছিলেন তাদের গবেষণার ক্ষেত্রে 'অযাচিত' হস্তক্ষেপ হিসেবে। আর তাছাড়া সামাজিক ডারউইনিজম আর ইউজিনিক্সের দগদগে ঘা তখনো মানুষের মন থেকে শুকোয়নি।মানব প্রকৃতি ব্যখ্যা করতে গিয়ে ' জিন' বা বংশানুকে নিয়ে আসায় উইলসনকে অভিযুক্ত হতে হয় নিও-সোশাল ডারউইনিস্ট অভিধায়। অভিযোগ করা হয় - উইলসন নিজের জাতিবিদ্বেষী মনোভাবকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন। উইলসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন সে সময়কার 'আদর্শবাদী' চিন্তাবিদেরা। তাদের অধিকাংশই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ছাড়া অন্য কোন বিশ্লেষণ দিয়ে মানব-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে মেনে নিতে বরাবরই অনাগ্রহী ছিলেন। Science for the People নামের বাম ভাবাদর্শে দীক্ষিত একটি সংগঠন উইলসনের বিরুদ্ধে সে সময় সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৮৪ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিন - এই তিন মাস্কেটিয়ার্স ১৯৮৪ সালে ' নট ইন আওয়ার জিনস' বইয়ে উইলসন এবং অন্যান্য সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের আক্ষরিক অর্থেই তুলোধুনো করেন। তারা তাদের বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, বিজ্ঞান এখন জাত্যাভিমানী পশ্চিমা পুঁজিবাদি সমাজের প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়েছে, আর উইলসন সেই বৈষম্যমূলক 'পুঁজিবাদী বিজ্ঞান'কে প্রমোট করছেন। তারা উইলসনের যমজ নিয়ে পরীক্ষা, পরিগ্রহণ পরীক্ষা প্রভৃতির উপর পদ্ধতিগত আক্রমণ পরিচালনা করেন, শুধু তাই নয় তাদের মার্কসবাদী দার্শনিক বিশ্বাস থেকে প্রস্তাব করেন জীববিজ্ঞানেও মার্ক্সবাদের মত 'দ্বান্দ্বিক'বা ডায়লেক্টিকাল পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এ নিয়ে অধ্যাপক রিচার্ড লেওনটিন একটি বইও লেখেন সে সময় – 'ডায়লেক্টিকাল বায়োলজিস্ট' নামে।

এর প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৮৫ সালে রিচার্ড লেওনটিন, স্টিফেন রোজ এবং লিওন কামিনের কাজের তীব্র সমালোচনা করে তাদের বইকে 'স্থুল, আত্মাভিমানী, পশ্চাৎমুখী এবং ক্ষতিকর' হিসবে আখ্যায়িত করে *নিউ সায়েন্টিস্ট* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ[†] লেখেন। অধ্যাপক ডকিন্স অভিযোগ করেন যে, লেওনটিনরা নিজস্ব দার্শনিকভিত্তি থেকে মদদপুষ্ট হয়ে সামাজিক জীববিজ্ঞানীদের উপর যেসমস্ত অভিযোগ করেছেন এবং যে ভাবে ভিত্তিহীন আক্রমণপরিচালনা করেছেন তা স্ট্রম্যান হেত্বাভাষ দোষে দুষ্ট। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করা, কোন 'বৈষম্যমূলক পুঁজিবাদ'কে প্রমোট করা নয়।

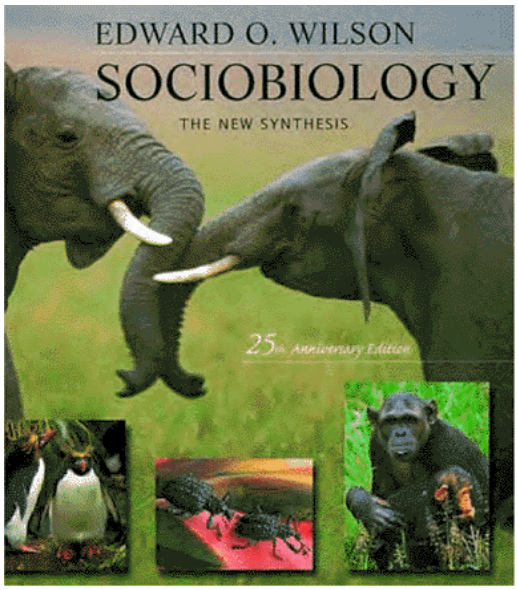

ছবি: অধ্যাপক উইলসনের সোশিওবায়লজি বইটির ২৫ বছর পুর্তি এডিশন (২০০৪)

সোশিওবায়লজি বইটি প্রকাশের তিনদশক পরে আজ এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, উইলসন সামাজিক বিবর্তনবাদ নিয়ে যে কাজ শুরু করেছিলেন তা মৌলিক ছিলো নিঃসন্দেহে। উইলসন সেই কাজটিই করেছিলেন যেটি ডারউইন পরবর্তী যে কোন জীববিজ্ঞানীর জন্য হতে পারে মাইলফলক। তখন তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও পরে অনেকেই তার কাজের গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছিলেন। উইলসন মানবপ্রকৃতি নিয়ে তার ব্যতিক্রমধর্মী কাজের কারণে দু-দুবার পুলিৎসার পুরস্কার পেয়েছিলেন।শুধু তাই নয় উইলসন যে কাজটি সামাজিক জীববিজ্ঞানকে এখন দেখা হয়

[†] Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature, Reviewed by Richard Dawkins in "Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 January 1985, On line link: http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Reviews/1985-01-24notinourgenes.shtml

বিবর্তনের সাম্প্রতিক গবেষণার অন্যতম সজীব একটি শাখা হিসেবে, যা পরবর্তীতে আরো পূর্ণতা পেয়েছে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) নামের ভিন্ন একটি নামে। উইলসনের সোশিওবায়লজি বইটির পর বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের জগতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল রিচার্ড ডকিন্সের '[সেলফিশ জিন]' (১৯৭৬) নামের অনন্যসাধারণ একটি বই। এই বইয়ের মাধ্যমেই ডকিন্স সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলেন কেন জেনেটিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তিনি তার বইয়ে দেখালেন যে, আমরা আমাদের এই দেহের পরিচর্যা নিয়ে যতই চিন্তিত থাকিনা কেন- দেহ কিন্তু কোন প্রতিলিপি তৈরি করেনা; প্রতিলিপি তৈরি করে বংশানু বা জিন। তার মানে হচ্ছে আমাদের দেহ কেবল আমাদের জিনের বাহক (vehicle) হিসেবে কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করে না। আমাদের খাওয়া, দাওয়া, হাসি কান্না, উচ্ছ্বাস, আনন্দ, সিনেমা দেখা, খেলাধূলা বা গল্প করা – আমাদের দেহ যাই করুক শেষ পর্যন্ত 'অত্যন্ত স্বার্থপর'ভাবে জিনকে রক্ষা করা আর জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দেয়াতেই উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে বাধ্য করে, বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোন থেকে জীবনের কোন 'উদ্দেশ্য' যদি থেকে থাকে তবে সেটাই সে উদ্দেশ্য। মা বাবারা যে সন্তানদের সুখী দেখতে পাবার জন্য পারলে জানটুকু দিয়ে দেয় – এটা কিন্তু জৈবিক তাড়না, আরো পরিস্কার করে বললে জিনগত তাড়না থেকেই ঘটে। শুধু মানুষ নয় অন্য যে কোন প্রানীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। 'পরবর্তী জিন' রক্ষা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুস- নুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোন অভিযোজিত মূল্য নেই। এক ধরণের ইঁদুর আছে যারা শুধু সঠিক সঙ্গী খুঁজে জিন সঞ্চালন করার জন্য বেঁচে থাকে। যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ ইঁদুরটি মৃত্যুবরণ করে। অথচ এই মৃত্যুকূপের কথা জেনেও পুরুষ ইঁদুরটি সকল নিয়ে বসে থাকে 'সর্বনাশের আশায়'। এক প্রজাতির 'ক্যানিবাল' মাকড়শা আছে যেখানে স্ত্রী মাকড়শাটি যৌনমিলনের পর পরই পুরুষ মাকড়শাটিকে খেয়ে ফেলে। সাক্ষাৎ এই মৃত্যুর কথা জেনেও দেখা গেছে পুরুষ মাকড়শাগুলো জিন সঞ্চালনের তাড়নায় ঠিকই তাড়িত হয়। অর্থাৎ, দেহ এবং জিনের সঙ্ঘাত যদি উপস্থিত হয় কখনো – সে সমস্ত বিরল ক্ষেত্রগুলোতে দেখা গেছে জিনই জয়ী হয় শেষপর্যন্ত। আমাদের দেহে 'জাংক ডিএনএ' কিংবা 'সেগ্রেগেশন ডিস্টরশন জিন'- এর উপস্থিতি সেই সত্যটিকেই তুলে ধরে যে – শরীরের ক্ষতি করে হলেও জিন অনেক সময় নিজেকে টিকিয়ে রাখে – অত্যন্ত 'স্বার্থপর ভাবে'ই। ডকিন্সের এ বইয়ের মূল্য একাডেমিয়ায় অনেক। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মত যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিস্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরো বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যখ্যা করতে পারলেন তারা। তবে তার চেয়েও বড় যে ব্যাপারটি ঘটল, সেটা হল

মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন ব্যখ্যা করার নতুন এক দুয়ার খুলে গেল জীববিজ্ঞানীদের জন্য। সেজন্যই 'Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think: Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers' নামের একটি বইয়ে তার সমসাময়িক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা বলেছেন, ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিশিজ' –এর পর কোন জীববিজ্ঞানীর লেখা বই যদি মানসপট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে, তো সেটি ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন'। এ ব্যাপারে ২০০১ সালে প্রকাশিত 'The Triumph of Sociobiology' গ্রন্থে জন অ্যালকের মন্তব্যটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক –

> 'প্রাণীজগতের আচরণ নিয়ে বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে কেউ 'সোশিওবায়োলজি' কিংবা 'সেলফিশ জিন' শব্দগুলো নিয়ে বেশি কথা বলার কিংবা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনবোধ করেন না – কারণ এগুলো এখন বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছে'।

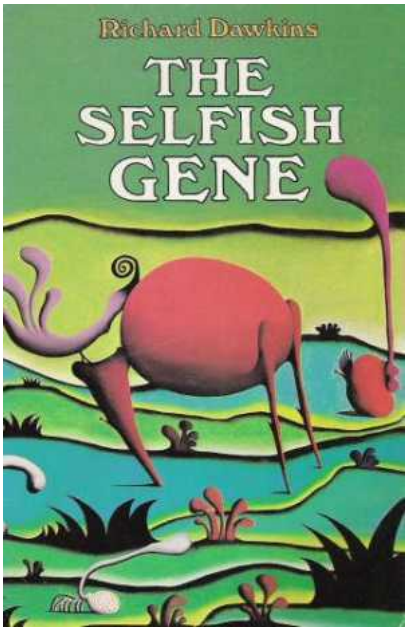

ছবি: ডকিন্সের সেলফিশ জিন যখন প্রথম ১৯৭৬ সালে বের হয় - তখন তার কভার ছিলো এরকম বিদঘুটে!

ডারউইন ১৮৫৯ সালে যখন তার সেই বিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজন অব স্পিশিজ' লিখেছিলেন, তখন তিনি পুরো বইটিতে মানুষের বিবর্তন নিয়ে তেমন কোন উচ্চবাচ্য করেননি। হয়ত অনাকাংখিত বিতর্ক এড়াতে গিয়েই এই কৌশল নিয়েছিলেন ডারউইন, যদিও বইয়ে মানব সমাজ এবং বিবর্তন নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই বলে –' Light will be

thrown on the origin of man and history'। এবং একই প্যারাগ্রাফে ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন –'In the distant future… Psychology will be based on a new foundation.'

মজার ব্যাপার হল - ডারউইন যেমন তার 'অরিজন অব স্পিশিজ' বইয়ে মানববিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে 'বিতর্কিত' হতে চাননি, ঠিক তেমনি তার একশ বছরেরও পরে বই লিখতে বসে ডকিন্স এবং উইলসনরাও তাদের হাটু কাঁপুনি থামাতে পারেননি। তারাও তাদের বইয়ে মানব সমাজ নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করে 'বিতর্ক'- এর কেন্দ্রবিন্দুতে আসতে হয়ত চাননি। ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন' সুস্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং আলোচনায় ভরপুর, কিন্তু প্রায় পুরোটাই তিনি সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নিম্নস্তরের প্রানীজগতের ক্ষেত্রে। উইলসন তার ৫২৬ পৃষ্ঠার ঢাউস আকারের বইটির পুরোটুকুতেই পিঁপড়া আর পোকামাকড় নিয়েই পড়ে ছিলেন, মানুষ নিয়ে কথা বলেছিলেন শেষ ২৮ পৃষ্ঠায় এসে। তারপরও ডারউইন যেমন বিতর্ক এড়াতে পারেননি, আধা মানুষ আর আধা বানরের কার্টুনের কেরিক্যাচার হজম করতে হয়েছে, ঠিক তেমনি ডারউইনের উত্তরসূরীদের নানা ধরণের কটুক্তি হজম করতে হচ্ছে ডারউইনেরই ভবিষ্যদ্বানী – 'সাইকোলজি উইল বি বেসড অন এ নিউ ফাউন্ডেশন'-কে পূর্ণতা দিতে গিয়ে।

ছবি: জন টুবি এবং লিডা কসমাইডস - বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা দম্পতি একটি কনফারেন্সে আমাদের মানসপটকে সুইস আর্মি ছুরির সাথে তুলনা করে দেখাচ্ছেন। তারা বলেন, বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত মানব মনের মডিউলগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই হাণ্টার- গ্যাদারারদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হয়েছিলো বলেই তার ছাপ আমরা এখনো বিভিন্ন কিছুতে খুঁজে পাই (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)।

তবে আধুনিক 'বিবর্তন মনোবিদ্যা'র জন্ম এদের কারো হাতে হয়নি, এর জন্ম হয়েছে মূলতঃ এক সেলিব্রিটি দম্পতি জন টুবি (নৃতত্ত্ববিদ) এবং লিডা কসমাইডস (মনোবিজ্ঞানী) –এর হাত দিয়ে। তারা ১৯৯২ সালে 'The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and

the Generation of Culture' যে বইটি লেখেন সেটিকে আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথমবারের মত সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলকে (standard social science model, সংক্ষেপে SSSM) প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং সামাজিক বিবর্তন এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপরেখা জৈববিজ্ঞানীয় দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেন। এই দৃষ্টিকোনটিকে আজ অনেকেই অভিহিত করছেন 'মনের নতুন বিজ্ঞান' ('the new science of the mind') নামে। যারা জন টুবি এবং লিডা কসমাইডসের এই 'নতুন বিজ্ঞানের' সাথে পরিচিত হতে চান, তারা অন লাইনে 'Evolutionary Psychology: A Primer' [‡] প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন।

১৯৯৪ সালে রবার্ট রাইট আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখলেন 'The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology' নামে। বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার উপর একটি পূর্ণাংগ বই। এই বইয়ের লেখক প্রথমবারের মত 'সাহস করে' ডারউইনের বিবর্তনের আলোকে মনোবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হন। শুধু তাই নয়, ডারউইনের জীবন থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখালেন, ভদ্র, সৌম্য, লাজুক স্বভাবের ডারউইনও শেষ পর্যন্ত আমাদের মতই জৈব তাড়নায় তাড়িত একধরণের 'এনিমেল' ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। রবার্ট রাইটের বইটির পর এই বিষয়ে গণ্ডা গণ্ডা বই লেখা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এর মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে যে বইটি ভাল লেগেছে সেটি হল ম্যাট রিডলীর লেখা 'The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature'। বইটি অসাধারণ রকমের সুখপাঠ্য। আমার লেখার পাঠকদের বইটি সুযোগ এবং সময়মত পড়ে দেখবার আহবান জানাই।

মানুষ কি সত্যই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়?

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামের সাম্প্রতিক এই শাখাটি তাহলে আমাদের কি বলতে চাচ্ছে? সাদামাঠা ভাবে বলতে চাচ্ছে এই যে, আমাদের মানসপটের বিনির্মাণে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ার একটি ছাপ থাকবে, তা আমরা যে দেশের, যে সমাজের বা যে সংস্কৃতিরই অন্তর্ভূক্ত হই না কেন। ছাপ যে থাকে, তার প্রমাণ আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুতেই কিন্তু পাই। মিস্টিযুক্ত কিংবা চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের শরীরের জন্য খারাপ, কিন্তু এটা জানার পরও আমরা এ ধরনের খাবারের প্রতি লালায়িত হই। সমাজ-

[‡] Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for Evolutionary Psychology. Online link: http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html

সংস্কৃতি নির্বিষেশেই এটা ঘটতে দেখা যায়। কেন? বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, একটা সময় মানুষ জঙ্গলে থাকত, খুব কষ্ট করে খাবার দাবার সংগ্রহ করতে হত। শর্করা এবং স্নেহজাতীয় খাবার এখনকার মত এত সহজলভ্য ছিলো না। শরীরকে কর্মক্ষম রাখার প্রয়োজনেই এ ধরণের খাবারের প্রতি আসক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। তখন তো আর কারো জানার উপায় ছিলো না যে, হাজার খানেক বছর পর মানুষ নামের অদ্ভুত এই 'আইলস্যা' প্রজাতিটি ম্যাকডোনাল্ডসের বিগ- ম্যাক আর হার্শিজ হাতে নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে বসে ব্লগ আর চ্যাট করে অফুরন্ত অলস সময় পার করবে আর গায়ে গতরে হোদল কুৎকুতে হয়ে উঠবে। কাজেই খাবারের যে উপাদানগুলো একসময় ছিলো আদিম মানুষের জন্য শক্তি আহরণের নিয়ামক কিংবা ঠান্ডা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সেগুলোর মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়ে উঠেছে তাদের জন্য মরণ- বিষ। কিন্তু এগুলো জেনেও আমরা আমাদের লোভকে সম্বরণ করতে প্রায়শঃই পারি না; পোলাও বিরিয়ানি কিংবা চকলেট বা আইসক্রিম দেখলেই হামলে পড়ি। আমাদের শরীরে আর মনে বিবর্তনের ছাপ থেকে যাবার কারণেই এটি ঘটে। এধরণের আরো উদাহরণ হাজির করা যায়। আমরা (কিংবা আমাদের পরিচিত অনেকেই) মাকড়শা, তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দেখলে আঁতকে উঠি। কিন্তু বাস ট্রাক দেখে সেরকম ভয় পাই না। অথচ কে না জানে, প্রতি বছর তেলাপোকার আক্রমণে যত মানুষ না মারা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ মরে ট্রাকের তলায় পড়ে। অথচ ট্রাককে ভয় না পেয়ে আমরা ভয় পাই নিরীহ তেলাপোকাকে। এটাও কিন্তু বিবর্তনের কারণেই ঘটে। বনে –জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটানোর কারণে বিষধর কীটপতংগকে ভয় পাবার স্মৃতি আমরা নিজেদের অজান্তেই আমাদের জিনে বহন করি। সে হিসেবে, বাস ট্রাকের ব্যাপারগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই এগুলোকে ভয় পাবার কোন স্মৃতি আমরা এখনো আমাদের জিনে (এখনো) তৈরি করতে পারিনি। সেজন্যই বোধ হয় বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লিডা কসমিডস এবং জন টুবি আধুনিক মানুষকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন – 'Our modern skull house a stone age of mind'।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান অনেক কিছু খুব পরিস্কার এবং বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করলেও, এর অনেক উপসংহার এবং অনুসিদ্ধান্ত এতই বিপ্লবাত্মক (Radical) যে এটি অবগাহন করা সবার জন্য খুব সহজ হয়নি, এখনো হচ্ছে না। এর অনেক কারণ আছে। একটা বড় কারণ হতে পারে - আমাদের মধ্যকার জমে থাকা দীর্ঘদিনের সংস্কার। অধিকাংশ মানুষ মনে করে, শিশুরা জন্ম নেয় একটা স্বচ্ছ স্লেটের মত, মানুষ যত বড় হতে থাকে – তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিপার্শিকতার মাধ্যমে ঐ স্বচ্ছ স্লেটে মানুষের স্বভাব ক্রমশঃ লিখিত হতে থাকে। অর্থাৎ, ভাল- মন্দ সবকিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে একমাত্র পরিবেশ। খারাপ পরিবেশে থাকলে স্লেটে লেখা হবে হিংস্রতা কিংবা পাশবিকতার বীজ, আর ভাল পরিবেশ পেলে স্লেটও হয়ে উঠবে আলোকিত। ব্রিটিশ দার্শনিক লক (১৬৩২ - ১৭০৪

খ্রীষ্টাব্দ) এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এখনো অনেকেই (বিশেষতঃ যাদের আধুনিক জেনেটিক্স কিংবা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান পড়া হয়ে উঠেনি) এই মতবাদে বিশ্বাস করেন। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই ধারণাটি বোধগম্য কারণেই খুবই জনপ্রিয়। এই কিছুদিন আগেও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তার এক বক্তৃতায় বললেন –

> 'একটি শিশু যখন ৬ বছর বয়সে প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করে তার মন থাকে যেন শুন্য এক বাস্কেট। তারপর ধীরে ধীরে তাদের বাস্কেট ভর্তি হতে শুরু করে। ১৮ বছর বয়স হতে হতে তাদের শূন্য বাস্কেট প্রায় পুরোটাই ভর্তি হয়ে উঠে। এখন কথা হচ্ছে কাকে দিয়ে শিশুটির এই বাস্কেট পূর্ণ হবে? এটা কি ভাল একজন শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু নাকি অসৎ মানুষজনদের দিয়ে?'

এই ব্ল্যাঙ্ক স্লেট তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানে খুবই জনপ্রিয় এবং বোধ্য কারনেই। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডার্খেইম ১৮৯৫ সালেই বলেছিলেন যে, 'সমাজবিজ্ঞানের প্রধান অনুকল্পই হল প্রতিটি মানুষকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হিসেবে চিন্তা করতে হবে। মানুষ হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট – অন হুইচ কালচার রাইটস'। এর পর থেকে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' দর্শনটি সমাজবিজ্ঞানের জগতে স্বততঃসিদ্ধ হিসেবেই পরিগন্য হয় – 'সব মানুষ আসলে জন্মগতভাবে সমান, খারাপ পরিবেশের কারণেই মানুষ মূলতঃ খারাপ হয়ে উঠে'।

কিন্তু এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট'- এর ধারণা কি আসলে মানবমনের প্রকৃত স্বরূপকে তুলে ধরে? এম.আই.টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের (বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যাপক অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার ২০০৩ সালে একটি বই লেখেন 'The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature' শিরোনামে। তিনি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে সমাজে গেঁথে যাওয়া এবং জনপ্রিয় এই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট'তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একে একধরণের 'ডগমা' হিসবে আখ্যায়িত করেন (ইন্টারনেটে ইউটিউবে অধ্যাপক পিঙ্কারের কিছু লেকচার রাখা আছে[§], উৎসাহী পাঠকদের জন্য নিঃসন্দেহে হবে মনের খোরাক)।

পিঙ্কার দাবী করেন, আমাদের কানে যতই অস্বস্তিকর শোনাক না কেন, কোন শিশুই আসলে 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' হয়ে জন্ম নেয় না। বরং একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রতিটি শিশু জন্ম নেয় কিছু না কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে পুঁজি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর ছাপ পরিণত অবস্থাতেও রাজত্ব করে অনেক ক্ষেত্রেই। শুধু মানুষ কেন - প্রানী জগতের দিকে

[§] অধ্যাপক পিঙ্কারের বক্তৃতার ইউটিউবের লিঙ্ক : http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c

দৃষ্টি দিলেও ব্যাপারটা খুব ভালমতই বোঝা যাবে। গুবরে পোকাকে ধরবার জন্য ইঁদুর যত তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে, কবুতর তত তাড়াতাড়ি পারে না। বিড়াল যত ভালভাবে রাতে দেখতে পায়, মানুষ তা পায় না। এই বিষয়গুলো কোনভাবেই 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা করা যায় না একই প্রজাতির মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যগুলোও। একই প্রজাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও কেউবা শ্লথ, কেউবা ক্ষিপ্র, কেউবা বাঁচাল, কেউবা শান্ত, কেউবা অস্থির, কেউ বা রয়ে যায় খুব চুপচাপ। জিনগত পার্থক্যকে গোনায় না ধরলে করলে প্রকৃতির এত ধরণের প্রকরণকে কোন ভাবেই সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

১৯৮০র দশকে টম ইনসেল নামে এক বিজ্ঞানী প্রেইরি ভোলস এবং মোন্টেন ভোলস নামে দু' প্রজাতির ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন প্রেইরি ভোলস নামের ইঁদুরগুলো নিজের মধ্যে একগামী সম্পর্ক গড়ে তুলে, যৌনসঙ্গির প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকে, বাচ্চা হবার পর তাদের পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে অনেকটা সময় এবং শক্তি ব্যয় করে। আর মোন্টেন ভোলসগুলো স্বভাবে ঠিক উলটো। তারা স্বভাবত বহুগামী, এমনকি বাচ্চা জন্মানোর পর সামান্য সময়ের জন্য বাচ্চাদের পরিচর্যা করার পর আর এদের দিকে নজর দেয় না। টম ইনসেল প্রেইরি ভোলস এবং মোন্টেন ভোলস এর মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে তেমন কোন পার্থক্যই পেলেন না, কেবল প্রেইরি ভোলস নামের ইঁদুরগুলোর ব্রেনে অক্সিটোসিন নামে এক ধরণের হরমোনের আধিক্য লক্ষ্য করলেন। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন মোন্টেন ভোলস ইঁদুরগুলোর ব্রেনে এই হরমোন একেবারেই নগন্য। কেবল, বাচ্চা জন্মানোর পর সামান্য স্ত্রী মোন্টেন ভোলসের মস্তিস্কে এই হরমোনের আধিক্য সামান্য সময়ের জন্য বেড়ে যায়। টম ইনসেল দেখলেন সেই সামান্য সময়টাতেই স্ত্রী ইঁদুর আর তার বাচ্চার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধনের উপস্থিতি থাকে। টম ইনসেল কৃত্রিমভাবে ইঁদুরদের ব্রেনে অক্সিটোসিন প্রবেশ করিয়ে তাদের স্বভাব এবং প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। দেখা গেলো, এই হরমোনের প্রভাবে মোন্টেন ভোলস ইঁদুরগুলো তাদের পছন্দের বহুগামী স্বভাব পরিবর্তন করে তার যৌনসঙ্গির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ ধরণের আরো গবেষণা করে দেখেছেন, জিন ম্যানিপুলেশন করে নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে আগ্রাসন, নমনীয়তা, হিংস্রতা, ক্ষিপ্রতা বা শ্লথতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির তারতম্য তারা ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ, বংশানুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের কারণে প্রাণীদের স্বভাবেও পরিবর্তন আসে। এখন কথা হচ্ছে, মানুষও কিন্তু প্রকৃতিজগত এবং প্রাণীজগতের বাইরের কিছু নয়। অথচ, বংশাণুজনিত পার্থক্যের কারণে মানুষে মানুষে স্বভাবগত পার্থক্য হতে পারে - মানুষের ক্ষেত্রে এই রূঢ় সত্যটি মানতে অনেকেই আপত্তি করবেন।

বংশানুর বৈশিষ্ট্যের তারতম্য যদি মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনের বলিষ্ট ব্যখ্যা হয়, তবে কাছাকাছি বা প্রায় একই বংশানুযুক্ত লোকজনের ক্ষেত্রে একই স্বভাবজনিত বৈশিষ্ট পাওয়া উচিত। স্টিভেন পিঙ্কাররা বলেন তাই পাওয়া যাচ্ছে। পিঙ্কার তার 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' বইয়ে অভিন্ন যমজদের (আইডেন্টিকাল টুইন) নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার বেশ কিছু মজার উদাহরণ হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অভিন্ন যমজদের একে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন পরিবেশে বড় করা হলেও তাদের মধ্যে এক আশ্চযর্জনক সাদৃশ্য থেকেই যায়, শুধু চেহারায় নয় - আচার, আচরণ, অভিরুচি, খাওয়া দাওয়া এমন কি ধর্ম কর্মের প্রতি আসক্তিতেও। ইউনিভার্সিটি অব মিনিসোটার গবেষকেরা একসময় পঞ্চাশ জোড়া অভিন্ন যমজদের নিয়ে গবেষণা করেন, যে যমজেরা জন্মের পর পরই কোন না কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভিন্ন ধরণের পরিবেশে বড় হয়েছিলো। তাদের নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষকেরা লক্ষ্য করলেন, তারা আলাদা পরিবেশে বড় হলেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়া সহোদরের সাথে আচার- আচরণে অদ্ভুত মিল থাকে। সবচেয়ে মজার হচ্ছে অভিন্ন যমজ সহোদর অস্কার এবং জ্যাকের উদাহরণটি। জন্মের পর পরই বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্কার বড় হয়েছিলো চেকোশ্লাভাকিয়ার এক নাৎসী পরিবারে, আর জ্যাক বড় হয়েছিলো ত্রিনিদাদের ইহুদী পরিবারে। তারপরও তারা যখন চল্লিশ বছর পরে প্রথমবারের মত মিনিসোটায় একে অপরের সাথে দেখা করতে আসলেন, তখন দেখা গেলো তারা দুজনেই গাঢ় নীল রঙের শার্ট পড়ে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের দু' জনের হাতের কব্জিতেই রাবারব্যান্ড লাগানো। দু' জনেই কফিতে বাটার টোস্ট ডুবিয়ে খেতে পছন্দ করতেন; তাদের দু' জনেই বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে টয়লেট ব্যবহারের আগেই একবার করে ফ্ল্যাশ করে নিতেন, এমনকি দু' জনেরই একটি সহজাত মুদ্রাদোষ ছিলো – দু'জনেই এলিভেটরে উঠে হাঁচি দেয়ার ভঙ্গি করতেন, যাতে লিফটের অন্য সহযাত্রীরা আঁতকে উঠে দু' পাশ থেকে সরে যায়। থমাস বুচার্ড নামের আরেক গবেষকের গবেষনায় জিম স্প্রিঙ্গার এবং জিম লুইস নামের আরেকটি অভিন্ন যমজের চাঞ্চল্যকর মিল পাওয়া গিয়েছিলো যা মিডিয়ায় রীতিমত হৈ চৈ ফেলে দেয়। জন্মের পর ভিন্ন পরিবেশে বড় হবার পরও জিম- যমজদ্বয় যখন একত্রিত হল, দেখা গেল – তাদের চেহারা এবং গলার স্বরে কোন পার্থক্যই করা যাচ্ছে না। একই রকম বাচনভঙ্গি, একই রকম চাহনি, একই রকম অবসাদগ্রস্থ চোখ। তাদের মেডিকেল- হিস্ট্রি থেকে জানা গেল, তারা দুজনেই উচ্চ রক্তচাপ, হেমোরইডস এবং মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগছেন। তারা দু'জনেই সালীম সিগারেটের ভক্ত, দুজনেরই টেনশনে নখ কামড়ানোর অভ্যাস আছে এবং দুজনের জীবনের একই সময় ওজন বাড়া শুরু হয়েছিল। শুধু তাই নয় – তাদের দুজনের কুকুরের নাম 'টয়'। তাদের দুজনের স্ত্রীদের নাম 'বেটি', এবং তাদের দুজনেরই আগে একবার বিবাহ- বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এবং এদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নামও কাকতালীয় ভাবে এক - 'লিন্ডা'। এখানেই শেষ নয় - দুজনের প্রথম সন্তানের নামও ছিলো একই – 'জেমস অ্যালেন'; যদিও নামের বানান ছিলো একটু ভিন্ন। আরেকটি

ক্ষেত্রে দেখা গেল দুই যমজ মহিলা হাতে একই সংখ্যার আংটি পড়ে এসেছিলেন। তাদের একজন প্রথম ছেলের নাম রেখেছিলেন রিচার্ড এন্ড্রু, আর অপরজন রেখেছিলেন এন্ড্রু রিচার্ড। সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে এসমস্ত মিলগুলোকে নিতান্তই 'কাকতালীয়' কিংবা 'অতিরঞ্জন' ভাবার যথেষ্ট অবকাশ থাকলেও মূল উপসংহার কিন্তু ফেলে দেয়ার মত নয় – আমরা আমাদের স্বভাব- চরিত্রের অনেক কিছুই হয়ত আসলে বংশানুর মাধ্যমে বহন করি এবং দেখা গেছে অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে এই উপরের 'কাকতালীয়' মিলগুলো অসদ যমজদের থেকে সবসময়ই বেশি থাকে। শুধু মিনিসোটার যমজ গবেষণা নয়; ভার্জিনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, সুইডেন এবং ব্রিটেনের গবেষকেরাও তাদের গবেষণা থেকে একই ধরণের ফল পেয়েছেন। এ ধরনের বেশকিছু গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে উইলিয়াম ক্লার্ক এবং মাইকেল গ্রুন্সটেইনের 'Are We Hardwired?: The Role of Genes in Human Behavior' নামের বইটিতে। লেখকদ্বয় বলেছেন –

> 'For nearly all measures personality, heritability is high in western society: identical twins raised apart are much more similar than the fraternal twins raised apart.'।

ছবি - একটি মজার কার্টুন - জন্মের পর পরই পৃথক হয়ে যাওয়া দুই যমজের হঠাৎ দেখা! (কার্টুনিস্ট - চার্লস এডামস); কার্টুনটি স্টিভেন পিঙ্কারের 'ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' বইটি থেকে নেওয়া।

সাইকোপ্যাথ এবং সিরিয়াল কিলারদের নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোও আমাদের জন্য অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি যখন এ লেখাটি লিখতে শুরু করেছি, তখন আমেরিকান মিডিয়া 'ক্রেগলিস্ট কিলার' খ্যাত ফিলিপ মার্ডফকে নিয়ে রীতিমত তোলপার। ফিলিপ মার্ডফ বস্টন মেডিকেলেরর ছাত্র। পড়াশোনায় ভাল। চুপচাপ শান্ত বলেই পরিচিতি ছিলো তার। একজন গার্লফ্রেন্ডও ছিলো তার। সামনেই বিয়ে করার কথা

ছিলো তাদের। ফিলিপ আর তার ভাবীবধুর ছবি সমন্বিত ওয়েবসাইটও সে বানিয়ে রেখেছিলো। কে জানত যে, এই গোবেচোরা ধরণের নিরীহ রোমান্টিক মানুষটিই রাতের বেলা কম্পিউটারে বসে বসে ক্রেগলিস্ট থেকে মেয়েদের খুঁজে নিয়ে হত্যা করত! পুলিশের হাতে যখন একদিন ফিলিপ ধরা পড়লো, সহপাঠিরা তো অবাক। এমন গোবেচরা ছেলেটির মধ্যে এমন দানব লুকিয়ে ছিল? গার্লফ্রেন্ডটি তখনো ডিনায়ালে – 'ফিলিপের তো মাছিটা মারতেও হাত কাঁপত, সে কি করে এত মানুষকে হত্যা করবে? পুলিশ নিশ্চয় ভুল লোককে ধরেছে'। আমেরিকায় প্রতি ২৫ জনে একজন মনোবিকারগ্রস্থ সাইকোপ্যাথ আছে বলে মনে করা হয়। মনোবিজ্ঞানী মার্থা স্কাউট তার 'The Sociopath Next Door' বইয়ে অন্ততঃ তিনটি জার্নাল থেকে রেফারেন্স হাজির করে দেখিয়েছেন যে, আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে একজন মনোবিকারগ্রস্থ সাইকোপ্যাথ। তারা আমার আপনার মত একই রকম 'ভাল পরিবেশে' বাস করছে, দৈনন্দিন জীবন যাপন করছে কিন্তু আপনার আমার মত সচেতনতা জিনিসটাকে মাথায় ধারণ করে না। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন রবার্ট হেয়ার তার 'Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us' বইয়ে। কোন নিয়ম, নীতি, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ তাদের মধ্যে তৈরি হয় না। আসলে এসমস্ত 'মানবিক' বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে একজন সাইকোপ্যাথের কাজকে ব্যাখ্যার চেষ্টাই হবে বোকামি। অত্যন্ত স্বার্থপর ভাবে মনোবিকারগ্রস্থ সাইকোপ্যাথ তার মাথায় যেটা থাকে, সেটা করেই ছাড়ে। যখন কোন সাইকোপ্যাথের মাথায় ঢোকে কাউকে খুন করবে, সেটা সম্পন্ন করার আগ পর্যন্ত তার স্বস্তি হয় না। পিঙ্কার তার বইয়ে জ্যাক এবট্ নামক এক সাইকোপ্যাথের উদ্ধৃতি দিয়েছেন খুন করার আগের মানসিক অবস্থা তুলে ধরে–

> 'তুমি টের পাবে যে তার জীবন- প্রদীপ তোমার হাতে ধরা ছুরির মধ্যে দিয়ে তির তির করে কাঁপছে। তুমি বুঝতে পারবে হত্যার জিঘাংসা তোমাকে ক্রমশঃ গ্রাস করে নিচ্ছে। তোমার শিকারকে নিয়ে একটু নিরালয়ে চলে যাবে যেখানে গিয়ে তুমি তাকে একেবারে শেষ করে দিতে পারো। ... মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকানোর মতই সহজ একটা কাজ – কোন ধরনের বাধাই তুমি পাবে না। তাদের চোখে শেষ মুহূর্তে এক ধরণের অন্তিম কাতরতা দেখবে, যা তোমাকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলবে'।

আমার প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম মন্টু মিয়াকে দিয়ে যে কিনা ইলাস্টিক দিয়ে জানালার কাঁচ ভাংগতো- সেই মন্টু মিয়া হয়ত মনোবিকারগ্রস্থতার একটু ছোট স্কেলের উদাহরণ। বড় বড় উদাহরণগুলোর কথা আমরা সবাই কম বেশি জানি। জ্যাক দ্য রিপার, ' বিটিকে কিলার' ডেনিস রেডার, ' গ্রীন রিভার কিলার' গ্রে রিজ ওয়ে, ' সন অব স্যাম' ডেভিড বার্কোউইজ, ' বুচার অব রুস্তভ' আঁদ্রে চিকাতিলো, চার্লস এং, ডেরিক টড

লি, জন ওয়েন গেসি প্রমুখ। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর যে বিষয়টি তুলে এনেছেন তার বইয়ে পিঙ্কার, সেটি হল - ''মনোবিকারগ্রস্তদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করা যায় না''। তিনি বলেন,

> Psychopaths, as far we know, cannot be 'cured'. Indeed, the psychologists Marine Rice has shown that has shown that certain harebrain ideas for therapy, such as boosting their self esteem and teaching them social skills, can even make more dangerous.

সমাজের নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ শেখানোর মাধ্যমে যে মনোবিকারগ্রস্থ মানুষদের স্বভাব অনেক সময়ই পরিবর্তন করা যায়না সেই 'সত্যটি' (?) পিঙ্কার তার বইয়ে তুলে ধরেছেন উপরে উল্লিখিত জ্যাক এবট্- এর একটি বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি এরকম : পুলিতজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক নর্মান মেইলার জেলখানায় বন্দী দাগি আসামী জ্যাক এবট্ - এর কিছু চিঠি পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে, যে তিনি নর্মান মেইলারকে জামিনে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন। নর্মান মেইলার সে সময় গ্যারি গিলমোর নামের আরেক অপরাধীকে নিয়ে একটি বই লেখার কাজ করছিলেন। জ্যাক এবট্ তার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখককে সহায়তা করার প্রস্তাব দেন। জ্যাক এবট্ - এর রচনা এবং চিন্তা ভাবনা নর্মান মেইলারকে এতটাই অনুপ্রাণিত করেছিল যে, তিনি এবট্কে 'প্রথাবিরুদ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং সম্ভাবনাময় লেখক' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন; শুধু তাই নয়, তাঁকে লেখা এবটের চিঠিগুলো সংকলিত করে তিনি ১৯৮০ সালে এবটের একটি বই প্রকাশ করতে সহায়তাও করেন, বইটির নাম ছিলো - 'In the belly of the beast' ।

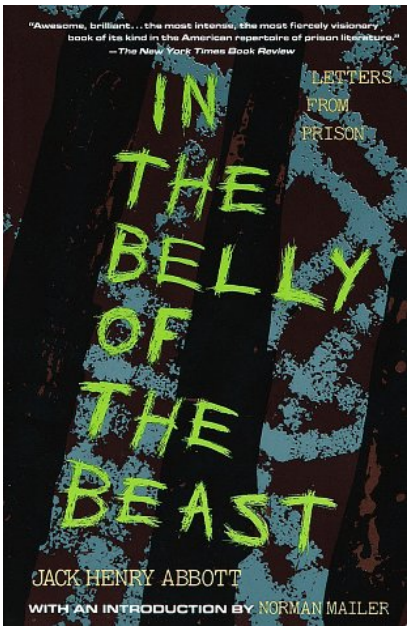

বইটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। নর্মান মেইলারের তদ্বিরে ছাড়া পাওয়ার পর এবট্ বেশ নামীদামী মহলে অনেক বিদগ্ধ লোকজনের সাথে নৈশভোজেও আমন্ত্রিত হতেন। অথচ এর মধ্যেই - ছ' সপ্তাহের মাথায় নিজের সাইকোপ্যাথেটিক চরিত্রের পুনঃপ্রকাশ ঘটালেন এবট এক রেস্তোরার বেয়ারাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। ভাগ্যের কি পরিহাস - এবট যেদিন দ্বিতীয় হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে পুলিশের খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন, ঠিক তার পরদিনই তার বই - 'In the belly of the beast' - এর চমৎকার একটি রিভিউ বেরিয়েছিলো নিউইয়র্ক টাইমস- এ । পত্রিকার সম্পাদক খুব আগ্রহ ভরেই সেটি ছাপিয়েছিলেন এবটের আগের দিনের হত্যাকান্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল

না থেকে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা খুব স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেই মনোবিকারগ্রস্থ কিংবা শিশুনিপীড়নকারীরা নিজেদের শিশুবয়সে নিপীড়নের শিকার হয়েছিলো, সেজন্যই বোধহয় তারা বড় হয়ে অন্য মানুষদের মেরে কিংবা শিশুদের ধর্ষণ করে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে। এ ব্যাপারটি অনেকাংশেই ঠিক নয়। আমি যে বিটিকে খুনি ডেনিস রেডার, ' গ্রীন রিভার কিলার' গ্রে রিজ ওইয়ের উদাহরণ দিয়েছি, তারা কেউই শিশু বয়সে নিপীড়নের শিকার হয়নি। ডেনিস রেডার ছোটবেলায় খুব ভাল পরিবেশেই বড় হয়েছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন, স্ত্রী, এবং দু ছেলে নিয়ে আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতই জীবন যাপন করতেন। উৎসাহী পাঠকেরা বিটিকে সিরিয়াল কিলার ডেনিস রেডারের উপর একটা ডকুমেন্টরী ইউটিউব ** থেকে দেখে নিতে পারেন।

গবেষক জোয়ান এলিসন রজার্স তাঁর 'Sex: A Natural History' বইটিতে লিখেছেন যে বেশীর ভাগ শিশু যৌন নিপীড়নকারীদের নিজেদের জীবনে শিশু নিপীড়নের কোন ইতিহাস নেই বলেই প্রমাণ মেলে। বংশাণুবিজ্ঞানী ফ্রেড বার্লিনের উদ্ধৃতি দিয়ে রজার্স তার বইয়ে বলেছেন যে, ' বিকৃত যৌন আচরণ শেখান নয়, এটা জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত'। অবশ্য তিনি এটাও বলতে ভুলেননি যে, সমাজকে রক্ষা করার জন্যই অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু একই সাথে ঐ আচরণকে অর্থাৎ এ ধরণের প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টাও আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। স্টিভেন পিঙ্কারও তাঁর বইয়ের ৩১১ পৃষ্ঠায় বলেন যে কানাডীয়রা আমেরিকানদের মত একই টিভি শো দেখে কিন্তু কানাডায় অপরাধজনিত হত্যার হার আমেরিকার ১/৪ ভাগ মাত্র। তার মানে সহিংস টিভি শো দেখে দেখে আমেরিকানরা সহিংস হয়ে উঠেছে – এই সনাতন ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই বলি 'হিন্দি ছবি দেখতে দেখতে পোলাটা বখে গেছে' কিংবা বলি 'ছোটবেলায় বাবা মা পিস্তল জাতীয় খেলনা কিনে দেয়াতেই আজকে পোলা মাস্তানি করে বেড়াচ্ছে'। কিন্তু এ ধরণের 'বিশ্লেষণ' আসলে কতটুকু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে? সত্যি বলতে কি - 'জেনেটিক ডিটারমিনিজম' ঠেকাতে আমরা নিজের অজান্তেই 'কালচারাল ডিটারমিনিজমের' আশ্রয় নিয়ে নেই। খুন খারাবির পেছনে জেনেটিক কোন প্রভাব থাকতে পারে, এটা অস্বীকার করে আমরা দোষারোপ করি ছোটবেলার খেলনাকে। কিংবা ধর্ষণের পেছনে পর্ণগ্রাফিকে। কিন্তু এই মনোভাবও যে আসলে উন্নত কোন কিছু নয় তা ম্যাট রীডলী তার 'এজাইল জিন' বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে – 'Cultural determinism can be as cruel as genetic determinism'। একই কথা বলেছেন নারীবাদী ডারউইনিস্ট হেলেনা ক্রনিন তার 'Getting Human Nature Right' প্রবন্ধে একটু

** বিটিকে কিলার, ইউটিউবের লিঙ্ক - http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q

অন্যভাবে- ‘কেউ যদি বংশানু নির্ণয়বাদকে ভয় পায়, তবে তার একই কারণে পরিবেশ নির্নয়বাদকেও ভয় পাওয়া উচিত’। পিঙ্কারও তার বইয়ে সহিংসতা নিয়ে আমাদের সনাতন ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, এ সমস্ত শিশুরা যুদ্ধ বা সহিংস খেলনার সাথে পরিচিত হবার অনেক আগেই সহিংস প্রবণতার লক্ষণ দেখায়। কাজেই শিশুরা আসলে আমাদের সমাজবিজ্ঞানীরা যেরকম ভাবে অনাদিকাল থেকে শিখিয়ে আসছেন – সেরকম ব্ল্যাঙ্ক স্লেট হয়ে জন্মায় না কখনই। আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে অনেক ক্ষেত্রেই এর স্বপক্ষে সত্যতা পাওয়া গেছে। তারপরেও ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট’ ডগমা আমাদের মানসপট আচ্ছন্ন করে আছে বহু কারণেই। বাংলায় ‘ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ডগমাকে’ খন্ডন করে মানব প্রকৃতির উপর জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে লেখা একেবারেই নেই বললেই চলে। মুক্তান্বেষার ২য় সংখ্যায় (জানুয়ারী ২০০৮) প্রকাশিত ‘মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত?’ নামের প্রবন্ধটি এ দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বলা যায়। আমার উপরের পরিসংখ্যানগুলোর অনেক কিছু অপার্থিবের লেখাতেও পাওয়া যাবে।

পাঠকদের মনে হয়ত চিন্তা আঁকিবুকি করতে শুরু করেছে এই ভেবে যে, এবটের মত উদাহরণগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে তো আমাদের কপালে ঘোর ‘খারাবি’ আছে। সব কিছু যদি ‘জিন’ই নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে তবে তো তা আমাদের ‘জেনেটিক ডিটারমিনেজম’ বা বংশানু নির্ণয়বাদের দিকে ঠেলে দেবে। চিন্তা করে দেখুন - সব কিছু যদি জিনেই লেখা থাকে তাহলে আর আমাদের চেষ্টা করেই বা কি লাভ? ‘জিনেই লেখা আছে ছেলে বড় হয়ে সিরিয়াল কিলার হবে’, আর ‘মনোবিকারগ্রস্থ মানুষদের স্বভাব পরিবর্তন করা যায়না’ - তা তো উপরেই দেখলাম। এই আপ্তবাক্যদ্বয় মেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে আর ভাগ্যবাদীদের সাথে পার্থক্য থাকল কোথায়?

না রসিকতা করছি না একেবারেই। আমার এই কথাকে হাল্কা কথা ভেবে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলে কিন্তু ভুল হবে। আমি হাল্কাভাবে ভাগ্যের কথা বললেও জেনেটিক্সের এই সমস্ত নতুন দিক বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই একদল ‘বিশেষজ্ঞ’ মানুষের আচার ব্যবহার, আনন্দ, হাসি কান্না, দুঃখ যাবতীয় সবকিছুকেই ‘জিনের’ মধ্যে খুঁজে পাওয়া শুরু করে দিলেন। এক দিকে রইলো ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ওয়ালারা - যারা সবকিছু পরিবেশ বদল করেই সমাধান করে ফেলতে চান, আর আর অন্যদিকে তৈরি হল আরেক চরমপন্থি ‘জেনেটিক ডিটারমিনিস্ট’- এর দল – যারা পরিবেশ অস্বীকার করে সব কিছু বংশানু দিয়েই ব্যাখ্যা করে ফেলেন। এই গ্রুপের একদল আবার আরো এক কাঠি সরেস হয়ে ‘জিন কেন্দ্রক ভাগ্যবাদ’ কিংবা ‘বংশানু নির্ণয়বাদ’ প্রচার করা শুরু করে দিলেন। যেমন, জিনোম প্রজেক্ট শেষ হবার পর পরই যুগল- সর্পিলের আবিষ্কারক অধ্যাপক জেমস ওয়াটসন বলা শুরু করলেন –

> ‘আগে মানুষ ভাবত আকাশের তারায় বুঝি ভাগ্য লেখা আছে। এখন মানুষ বুঝবে, ভাগ্য তারায় লেখা নেই, তার ভাগ্য লেখা রয়েছে জিনে’!

কিন্তু সত্যই কি তাই? ব্যাপারটা কি এতই সরল? ওয়াটসনের কথা মত মানুষের সমস্ত ভাগ্য কি তাহলে জিনেই লেখা আছে?

এপিজেনেটিক্স এবং নিউরোপ্লাস্টিসিটির শিক্ষা

না এতটা ভাগ্যবাদী কিংবা নৈরাশ্যবাদী হবার কোন কারণ নেই। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বংশানুগুলো আমাদের মানসপটের বিনির্মাণ করলেও সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোহার দরাজের মত অনড় নয়, বরং অনেকক্ষেত্রেই কাদামাটির মতই নরম। পরিবেশের প্রভাবে এদের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটানো যায় - অনেকটা বিদ্যুতের বাতির সুইচ অন অফ- এর মতই। যে বংশানুগুলোকে কয়েক বছর আগেও মনে করা হত একদমই অনমনীয়, মনে করা হত বংশানুর গঠনের সিংহভাগই ভ্রূণে থাকা অবস্থায় তৈরী হয়ে যায়, ভাবা হত পরবর্তীকালের পরিবেশে এদের রদবদল হয় সামান্যই, আধুনিক ‘এপিজেনেটিক্স’এর গবেষণা হতে পাওয়া ফলাফল এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে বলেই এখন মনে করা হচ্ছে। জীববিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি থেকে আমরা ক্রমশঃ জানতে পারছি পরিবেশ থেকে সংকেত নিয়ে দেহ কিভাবে তার অভ্যন্তরস্থ জিনের প্রকাশভঙ্গিকে (genetic expression) বদলে ফেলে। এজন্যই অনেক বিজ্ঞানী এদের চিহ্নিত করেন ‘নমনীয় জিনোম’ (Malleable Genome) হিসেবে, কেউ বা নাম দিয়েছেন ‘এজাইল জিন’। সায়েন্টিফিক মাইন্ডের ‘Determining Nature vs. Nurture : Molecular evidence is finally emerging to inform the long-standing debate’ (2006) প্রবন্ধে আধুনিক ‘এপিজেনেটিক্স’এর বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ ডাওসন চার্চ তার সাম্প্রতিক ‘The Genie in Your Genes’ বইয়ে পরিস্কার করেই বলেছেন –

> ‘Science is discovering that while we may have fixed set of genes in Chromosomes, which of those Genes is active has great deal to do which our subjective experiences, and how we process them’।

পিঙ্কারের উদাহরণে আরেকটিবার ফেরত যাই। সাইকোপ্যাথ জ্যাক এবটের অনমনীয় মনোভাবের যে উদাহরণ পিঙ্কার তার বইয়ে হাজির করেছেন তা হয়ত অত্যধিক ‘চরম মাত্রার’ উদাহরণ। আমাদের চারপাশের উদাহরণগুলো এমনতর চরম সীমায় অবস্থান করে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ পরিবর্তন করে করে কিংবা

কড়া সামাজিক নিয়ম নীতি প্রয়োগ করে মানুষের ব্যবহার যে পরিবর্তন করা যায়, তা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। আমার জীবন থেকেই একটা উদাহরণ হাজির করি-

প্রথম আমেরিকায় আসার পর নতুন নতুন গাড়ি চালানো শুরু করেছি। প্রায় দু'বছর বড় ধরণের কোন এক্সিডেন্ট ছাড়া সময় পার করে দেবার পর সাহস গেল অতিমাত্রায় বেড়ে। হাইওয়ে ছেড়ে বাসার উপরের ছোট্ট রাস্তায় ঢুকতে হলে যে একটু গতি কমিয়ে ঢুকতে হবে – তা মাথায়ই থাকতো না। যে রাস্তায় চলাচলের গতিসীমা সর্বোচ্চ ৩৫, সে রাস্তায় আমি ঢুকতাম প্রায় ৫০ মাইল বেগে। ফলে যা হবার তাই হল, এক বিকেলে অফিস থেকে ফেরার পথে ঘাপটি মেরে বসে থাকা পুলিশের গাড়ীর খপ্পরে পড়ে গেলাম। ব্যাস জড়িমানা গুনতে হল। দিন কয়েক খুব সাবধানে গাড়ি চালালাম। তারপর ক'দিন বাদেই আবার যেই কি সেই। একদিন সকালে উঠে দেখলাম ঘড়িতে বাজে সাড়ে আটটা। ঠিক নয়টায় অফিসে একটা জরুরী মিটিং আছে। গাড়ি বের করে দেখলাম তেল নেই। তেল নিতে গিয়ে আরো মিনিট দশেক নষ্ট হল। এবারে বুঝলাম মিটিং আর ধরা যাবে না। পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ী বের করে সেই রাস্তাটায় উঠে যেই না এক্সিলেটরে পা রেখে মেরেছি এক ধুন্ধুমার টান – অমনি পাশ থেকে পুলিশ বাবাজীর অভ্যুদয়। আবারো জড়িমানা। এক মাসের ব্যবধানে একই রাস্তার উপরে দু'দুবার টিকেট পাওয়ার পর বোধ হয় চৈতন্য ফিরলো। ফিরবে নাই বা কেন - এমন টিকেট আর বার দুয়েক পেলেই আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাই চলে যাবে। এখন হাইওয়ে থেকে রাস্তায় উঠলেই দেখি যতই আনমনা থাকি না কেন, স্পীডোমিটারের কাঁটা কখনই ত্রিশ অতিক্রম করে না। শাস্তির ভয়ে কিংবা কঠোর নিয়ম নীতি আরপের ফলে যে মানুষ তার বহুদিনের অভ্যাস পরিবর্তন করতে পারে এটাই তো একটা ভাল উদাহরণ।

আরেকটা উদাহরণ দেই। আমার পরিচিত এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক (সঙ্গত কারণেই নামটি উল্লেখ করছিনা) বাংলাদেশ থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে আমেরিকায় এসেছেন। স্বভাবে একটু বদরাগী। রাগের সময় মাথা ঠিক থাকে না অনেক সময়ই। ঝগড়ার সময় বউকেও চড় থাপ্পর মেরে বসেন। বউও প্রথম প্রথম সহ্য করত, কিংবা হয়ত মানিয়ে নিতে চাইত। কাউকে বলতো না। সবাই ভাবতো সুখের সংসার বুঝি তাদের। আর বউকে নেহাৎ গোবেচারা পেয়ে স্বামীরও সাহস গেল বেড়ে। নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল। একদিন বউ থাকতে না পেরে নাইন- ওয়ান- ওয়ানে সোজা কল করে দিলো। পুলিশ এসে স্বামী বাবাজিকে ধরে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক বোধ হয় ভেবেছিলেন বউয়ের গায়ে একটু আধটু হাত তোলা আর এমন কি অপরাধ। দেশে তো সবাই করে! কিন্তু আমেরিকায় এগুলো আইন কানুন খুবই কড়া। তারপরও পুলিশ ভদ্রলকের কান্নাকাটি দেখে হয়ত মায়া করে গারদে না ঢুকিয়ে বকা ঝকা দিয়ে শেষপর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। মনে করিয়ে দিলেন এরপর যদি গায়ে হাত তোলার অভিযোগ আসে, তাহলে তার কপালে বিপত্তি আছে।

ভদ্রলোকও ছাড়া পেয়ে ভাবলেন 'যাক! অল্পের উপর দিয়ে ফাঁরা কাটানো গেছে'। কিছু দিন ভাল থাকলেন, সংসার ধর্ম পালন করলেন। কিন্তু কথায় বলে বউ পেটানর স্বভাব নাকি মজ্জাগত, একবার যে বউয়ের গায়ে হাত তুলে, সে নাকি আবারো তুলে। ভদ্রলোকও আরেকদিন ঝগড়ার সময় বউয়ের গালে থাপ্পর মেরে বসলেন। আর বউও কল করলেন পুলিশে। এবারে ফলাফল হল ভয়াবহ। স্বামী প্রবরকে ধরে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হল সোজা জেল হাজতে। কেউ ছাড়াতে এলো না। এমনকি কাছের বন্ধু- বান্ধবেরাও নয়। দু'দিন হাজতবাসের পর শেষ পর্যন্ত স্বামীর কান্নাকাটিতে বোধ হয় বউয়ের দয়া হল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে হোক, আর সামাজিকতার চাপেই হোক শেষ পর্যন্ত তিনি স্বামীর উপর থেকে অভিযোগ তুলে নিয়ে স্বামীকে জেল থেকে বের করে আনলেন। তবে পুলিশের মন এত সহজে গললো না। একেবারে ঠিকুজি কুঠি সমস্ত বৃত্তান্ত ফাইলবন্দী করে রাখলেন। বলে রাখলেন, তাকে নজরবন্দী রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোন ধরণের উল্টো-পাল্টা আচরণ দেখলেই সোজা ডিপোর্ট করে দেয়া হবে। তা বউ- পেটানো স্বভাব মজ্জাগত হোক আর শয্যাগতই হোক, পুলিশের ধাতানির উপর তো আর কারো কথা নাই, কারণ বাঘে ছুলে পনের ঘা, আর পুলিশে ছুলে নাকি আঠারো ঘা। আর তাছাড়া ডিপোর্ট হবার ভয় আসলেই বাঙ্গালীর বড় ভয়। সবকিছু মিলিয়ে ভদ্রলোক এমন চুপসানো চুপসালেন যে, তার সেই পরিচিত আগ্রাসী চরিত্রই গেল বদলে। কারো সামনে আর মুখ তুলে কথা বলেন না। বউয়ের উপর এখন রাগ করা তো দূরের কথা - বউকে তোয়াজ করা ছাড়া এক পা চলেন না। বাংলায় যাকে বলে 'স্ত্রৈণ পুরুষ' – সেটাতেই রূপ নিয়ে নিলেন পুরোমাত্রায়। এই ঘটনার পর বহুবছর কেটে গেছে। বউয়ের উপর নির্যাতনের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। কাজেই জিন- ওয়ালাদের দাবী অনুযায়ী বউ পেটানোর অভ্যাস যদি কারো মজ্জাগত কিংবা বংশানুক্রমিক হয়েও থাকে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চাপ অর্থাৎ সর্বোপরি পরিবেশ বাধ্য করে তার প্রকাশভঙ্গিকে বদলে ফেলতে।

আমার গাড়ি চালানোর উদাহরণটা কিংবা উপরের 'ভদ্রলোকের' বউ- পেটানোর উদাহরনটি নেহাৎ খুব ছোট স্কেলে, বড় স্কেলে ঘটা উদাহরণগুলোতে একটু চোখ বুলাই। দেশে যখন খুন- খারাবী কিংবা রাহাজানি বেড়ে যায়, তখন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন শৃংখলা বাড়ানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়, কখনো বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয় বা ট্রাইবুনালের ব্যবস্থা নেয়া হয়। আশির দশকে যখন বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপের হার ভয়ানকভাবে বেড়ে গিয়েছিলো, তখন সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আইন প্রবর্তন করে তা বন্ধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো, জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিলো – যেন এধরনের অমানুষিকতা বন্ধ হয়। বছর খানেকের মধ্যে দেখা গেল এসিড নিক্ষেপের হার অনেক কমিয়ে আনা গিয়েছে। দেশের বাইরে এ ধরনের উদাহরণ আরো অনেক বেশি। বহু দাগী আসামী যারা তারুন্যে সহিংস কিংবা জনবিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত ছিলো,

কিংবা পরিচিত ছিলো গ্যাংস্টার হিসেবে তাদের অনেককেই পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তাদের ব্যাবহার পরিবর্তন করেই। এদের অনেকেই তাদের অতীতের কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ করে বইও লিখেছেন, কেউ বা আজ এক্টিভিস্ট হিসবে কাজ করছেন; মানুষকে তাদের অতীত থেকে শিক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করেছেন। দাবী- দাওয়া পূরণ করে ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের কারখানায় ফিরিয়ে নেওয়া, সারের দাম কমিয়ে কৃষকদের শান্ত করার উদাহরণ আমরা প্রতিদিনের পত্রিকাতেই পড়ি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কার্ফু জারি করে উন্মত্ত জনতাকে স্বাভাবিক আর শৃঙ্খলিত জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় তা আমরা বহুক্ষেত্রেই দেখেছি।

তাই জিন আমাদের মানসিক কাঠামোর বীজ বপন করলেও কখনোই আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে না। পরিবেশের একটা প্রভাব থেকেই যায়। চাকরির টেনশন, স্ট্রেসফুল জীবন যাপনের প্রভাব শরীরে যে পড়ে সেটা পরীক্ষিত সত্য। ধূমপান, অত্যধিক মদ্যপান, ড্রাগ সেবনের প্রভাব শরীরে আছে বলেই ডাক্তাররা সেগুলো থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে পরামর্শ দেন। সেজন্যই একই ধরনের জিন শরীরে বহন করার পরও অনেক সময় দেখা যায়, অভিন্ন যমজদের একজন দিব্যি সুস্থ সবল রয়েছে, অন্যজন বেহিসেবী জীবন যাপনে শরীরকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। ২০০৬ সালের আগাস্ট মাসে প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় ‘Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes’[††] প্রবন্ধে কলামিস্ট জিনা কোলাটা দুই যমজ বোনের উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন এক বোন ৯২ বছর বয়সেও দিব্যি সুস্থ সবল এবং রোগমুক্ত জীবনযাপন করছে, অথচ অন্য যমজ বোনটির অবস্থা আক্ষরিক অর্থেই ‘কেরোসিন’! সম্প্রতি রোগাক্রান্ত বোনটির ‘হিপ রিপ্লেসমেন্ট’ করতে হয়েছে, ‘ডিজেনেরেটিভ ডিসঅর্ডারে’ দৃষ্টিশক্তি প্রায় পুরোটাই চলে গেছে। দেহের অস্থিক্ষয়ের পরিমাণও উল্লেখ করার মতই। আসলে জীবন- যাপন এবং অভ্যাসের প্রভাব যে দেহের উপর পড়ে তা অস্বীকার করা উপায় নেই। সে জন্যই চিকিৎসক অধ্যাপক মাইকেল রেবিনফ বলেন,

> ‘অভিন্ন যমজেরা একই ধরনের জিন বিনিময় করলেও সেই জিনগুলো দেহে একই ধরনের রোগের প্রকাশ অনেকসময়ই ঘটায় না, যদিও সাধারণভাবে ব্যাপারটিকে খুবই জেনেটিক বলে মনে করা হয় ।’

[††] Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes, GINA KOLATA, The NewYork Times, August 31, 2006, Online link:
http://www.nytimes.com/2006/08/31/health/31age.html

ছবি - জোসেফাইন তেজাউরো এবং তার জমজ বোন - জেনেটিক প্রকৃতি এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের দৈহিক অবস্থা একই রকম নয় (নিউইয়র্ক টাইমস, অগাস্ট ২০০৬)।

আরেকটি চাঞ্চল্যকর ফলাফল পাওয়া গেছে সম্প্রতি অধ্যাপক র‍্যান্ডি জার্টেল এর ইঁদুর নিয়ে গবেষণা থেকে। তিনি দেখেছেন, Agouti নামের যে জিনটি মানুষের ওবিসিডি এবং টাইপ২ ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় সেটি এক ধরণের ইঁদুরের মধ্যেও প্রবলভাবে দৃশ্যমান। হলুদ বর্ণের এই এগুটি ইঁদুর জন্মের পরপরই রাক্ষসের মত কেবল খেয়েই চলে। এবং এদের অধিকাংশই মানুষের মত ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। এমনকি তাদের বাচ্চা জন্ম নিলেও তারা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি নিয়েই জন্মায়। অধ্যাপক জার্টেল কিছু ইঁদুরকে আলাদা করে ল্যাবের কাঁচের জারে রেখে তাদের খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটালেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেখলেন ইঁদুরদের জেনেটিক প্রকাশভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে, এবং বাচ্চা যা জন্ম নিচ্ছে তা অধিকাংশই রোগের ঝুঁকিমুক্ত। এমনকি সদ্য জন্মানো বাচ্চার গায়ের রঙেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পেলেন গবেষকেরা। আনবিক স্তরে জেনেটিক কোডের কোন ধরণের পরিবর্তন না করে শুধু খাদ্যাভাস এবং পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের এক অনন্য নজির পেলেন তারা। তারা বুঝলেন মানুষের ক্ষেত্রে জেনেটিকভাবে হৃদরোগ কিংবা ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের অনেকেই জন্মানোর পরও ডাক্তারদের কথা শুনে কম শর্করা আর চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস করে, নিয়মিত ব্যায়াম করে, ধূমপানমুক্ত জীবন যাপন করে কিভাবে আমরা এ সমস্ত রোগের ঝুঁকি কমিয়ে নিতে পারি।

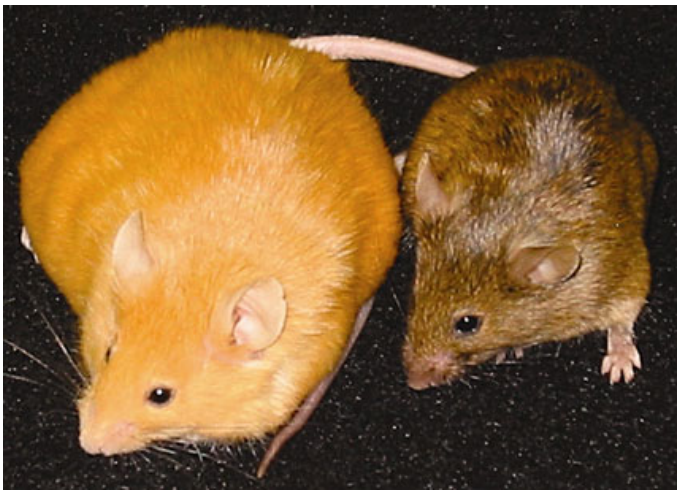

ছবি - কেবল মা ইঁদুরের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে অধ্যাপক জার্টেল দেখলেন ইঁদুরটি যে বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে তার দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আলাদা (ডিস্কভার, নভেম্বব, ২০০৬)।

এখন কথা হচ্ছে, পরিবেশ বদলে দিয়ে দেহজ বৈশিষ্ট্য যদি পরিবর্তন করা যায় তা না হয় দেখলাম, কিন্তু পরিবেশ বদলে দিয়ে একইভাবে মানসিক প্রকাশভঙ্গিকেও কি বদলানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলেন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। মোজে সিজফ এবং মাইকেল মেনি – এ দুজন বিজ্ঞানীও জার্টেলের মতই ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তারা দেখলেন একধরণের ইঁদুর আছে যাদের মা ইঁদুরেরা তাদের বাচ্চাদের জন্য জন্য কোন ধরণের যত্ন- আত্তি করে না। মা'দের আরেক দল আছে যারা আবার বাচ্চা জন্মানোর পর থেকেই জিব দিয়ে গা চেটে আর অতিরিক্ত আদর যত্ন করে বাচ্চাদের বড় করে। দেখা গেছে যে বাচ্চাগুলোর আদর যত্ন নেয়া হয় তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠে। আর মায়ের অবলায় থাকা বাচ্চারা বেড়ে উঠে অস্থির আর ভীতু স্বভাবের হয়ে। তাদের দু দলের ব্রেনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা। আদর পাওয়া বাচ্চাদের মস্তিস্কের হিপোক্যাম্পাস নামের প্রত্যঙ্গটি থাকে অনেক বিবর্ধিত, আর তাদের স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের (cortisol) উপস্থিতি অনেক কম পাওয়া গেল। আর অবহেলায় বড় হওয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই হরমোন পাওয়া গেল অনেক বেশি। মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যারা খুব স্ট্রেস্ফুল জীবন যাপন করে থাকে, তাদের দেহে কর্টিসলের উপস্থিতি থাকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। তাদের হৃদরোগের ঝুঁকিও থাকে অনেক প্রবল। ডঃ সজফ এক অদ্ভুত কাজ করলেন। তিনি ওই ভীতু ইঁদুর দলের ব্রেনে এমন এক ধরণের এনজাইম (এসিটাইল গ্রুপ) প্রবেশ করালেন যা কর্টিসলের উৎপাদনকে বাধা দেয়। দেখা গেল ইঁদুরদের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন অনেক সাহসী হয়ে উঠেছে। আবার একইভাবে আদরে বড় হওয়া সাহসী ইঁদুরের দল থেকে ইঁদুর নিয়ে তাদের মাথায় মিথাইল গ্রুপ প্রবেশ করিয়ে ভীতু আর অস্থির বানিয়ে দিলেন তারা। এদের গবেষণাকে

ফিচার করে সম্প্রতি একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা ডিস্কভার- এ। প্রবন্ধের শিরোনাম - DNA Is Not Destiny [##]।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে (উপরের উদাহরণে) দেখা গেছে, যে সব বাচ্চাকে আদর যত্ন নেয়া হয়েছে তারা অনেক সাহসী, সামাজিকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন আর শান্ত হয়ে বেড়ে উঠেছে। তারা থাকে অন্যদের প্রতি অনেক সংবেদনশীল। আর মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে বড় হওয়া বাচ্চাগুলো হয়ে উঠে অস্থির, ভীতু এবং অসামাজিক। মানুষের ক্ষেত্রেও কি এটা ঘটা সম্ভব নয়? যে বাচ্চারা মা বাবার আদর যত্ন না পেয়ে অবহেলায় বড় হয় তাদের মধ্য থেকেই একটা অংশ হয়ত বড় হয়ে অসামাজিক কাজ কর্মে জড়িয়ে পড়ে? ব্যাপারটা সরলীকরাণ মনে হলেও এটা ঘটা সম্ভব খুবই সম্ভব। সেজন্যই বোধ হয় প্রতিটি মা বা শিশুকে একটা ভাল পরিবেশ দিয়ে আদর যত্ন করে বড় করতে চান। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিক নেস্টলার দীর্ঘদিন ধরে বিষন্নতায় ভোগা রোগীদের মাথার ভিতরে হিপোক্যাম্পাস পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, তাদের হিপোক্যাম্পাসের আকার এবং আয়তন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক সঙ্কীর্ণ থাকে। শুধু তাই নয়, তাদের হিপোক্যাম্পাসের মধ্যকার একধরণের প্রোটিনে (হিস্টোন) মিথাইল গ্রুপের অস্তিত্ব আবিস্কার করেছেন (অনেকটা ওই ভীতু ইঁদুর দলের মতই)। বিজ্ঞানীরা এখন জানেন কিভাবে মানুষের বিষন্নতা সারাতে হয়। তারা ওষুধের মাধ্যমে এসিটাইল গ্রুপকে হিস্টোনের সাথে সংযুক্ত করে দেন, যা মিথাইল গ্রুপের কাজকর্মকে বাধা দেয়। এজন্যই এন্টি- ডিপ্রেসেন্ট ওষুধগুলো এত সহজে কাজ করে – বিষন্নতা দূর করে মনকে ফুরফুরে করে তোলে। শিকাগোর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেনিস গ্রেসন স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্তান্ত রোগীদের উপর এসিটাইল গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করে অনেক রোগীকেই সারিয়ে তুলতে পেরেছেন। অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন শিশু বয়েসের পরিবেশ, পরিচর্যা আমাদের মানসজগত গঠনে সাহায্য শুধু করে না, পরবর্তীতে জিনের প্রকাশভঙ্গিকে বদলে দেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে। যতই এপিজেনেটিক্সের আধুনিক গবেষণার ফলাফল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, ততই মানব প্রকৃতির রহস্যোদঘাটনে জেনেটিক্সের পাশাপাশি পরিবেশ এবং পরিচর্যার গুরুত্ব আরো বেশি করে বোঝা যাচ্ছে, আর এগুলো মানব প্রকৃতি বিষয়ক বিতর্কে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের ২০০৬ সালের অক্টোবর- নভেম্বর সংখ্যায় এ জন্যই বলা হয়েছে –

[##] DNA Is Not Destiny, The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity, and identity; Ethan Watters, Discover Magazine, Nov. 2006 issue, Online link: http://discovermagazine.com/2006/nov/cover/?searchterm=Randy%20Jirtle

> নতুন গবেষণার ফলাফলের আলোকে এখন বোঝা যাচ্ছে মায়ের পরিচর্যার রীতি শিশুর জিনের প্রকাশভঙ্গির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

এপিজেনেটিক্স ছাড়াও ব্রেনের নিউরোপ্লাস্টিসিটি নিয়ে পল ব্যাচি রিটা, মাইকেল মার্জেনিচ, ভিলায়ানুর রামাচন্দ্রনের আধুনিক গবেষণাগুলোও খুব পরিস্কারভাবে দেখিয়েছে কিভাবে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের মস্তিস্কও নিজেকে বদলে ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরো বিষদভাবে জানতে হলে উৎসুক পাঠকেরা নর্মান দইজের The Brain That Changes Itself (২০০৭) বইটি পড়ে নিতে পারেন।

তাহলে পরিবেশ নির্নয়বাদ বনাম বংশানু নির্ণয়বাদের এই দড়ি টানাটানি থেকে তাহলে কি উপসংহার বেরিয়ে এলো? বেরিয়ে এলো যে, সম্পূর্ণ বংশানুনির্ণয়বাদী হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ পরিবেশ নির্ণয়বাদী হওয়া - দুই ক্ষেত্রই ভুল। মানব প্রকৃতি গঠনে জিন বা বংশানুর প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে পরিবেশের। জিনের গুরুত্ব এ কারণে যে, আমরা বংশগতভাবে যে সমস্ত জিনগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছি, তার টার্ন অন বা অফের মাধ্যমে জেনেটিক এক্সপ্রেশন বদলাতে পারি পরিবেশ থেকে বিবিধ সিগন্যাল নিয়ে। কিন্তু কোন কারণে সেই মুল জিনটিই যদি আমার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, আমি যত সিগন্যাল পাঠাই না কেন তা বদলানো সম্ভব হবে না। আবার পরিবেশের গুরুত্ব সবসময়ই থাকবে কারণ জিনের প্রকাশভঙ্গী বদলানোর ব্যাপারটা নির্ভর করছে পরিবেশ থেকে কি ধরণের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে তার উপর [§§]। আমাদের আমাদের শরীরের ওজনের কথাই ধরা যাক। অনেক ক্ষেত্রেই দেহের কাঠামো মোটা হবে না চিকন হবে - তার অনেক কিছুই কিন্তু জেনেটিক। কিন্তু তা বলে জিনের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকি না। আপনার যদি একটুতেই 'মুটিয়ে' যাবার প্রবণতা থাকে, তবে আপনি খাবারের উপর আরো যত্নবান হবেন, ব্যায়াম করবেন, চর্বি জাতীয় খাবার কম খাবেন - এইটাই ধর্তব্য। তা না করে আপনি যদি বেহিসেবী জীবন কাটাতে থাকেন, খানা পিনা পানীয় - এর প্রতি লালায়িত থাকেন, সমানে ভুরিভোজ করে যেতে থাকেন- হয়ত আপনার দেহের জিনগুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে আপনার দেহকে নাদুস নুদুস করে তুলবে। কাজেই জিনের অভ্যন্তরস্থ জিনগত প্রকাশভঙ্গি কিভাবে বদলাবেন - তার অনেক কিছুই কিন্তু আপনার দেয়া পরিবেশের উপরই নির্ভর করবে।

[§§] কিছু কিছু ব্যাপারকে পুরোপুরি জেনেটিক বলে মনে করা হয়। যেমন, যেমন, হান্টিংটন রোগ - এই রোগটি ১০০% জেনেটিক। এটা পরিবেশ নির্ভর নয়। আবার শিশুদের মাতৃভাষা রপ্ত করার বিষয়টিকে পুরোপুরি পরিবেশ নির্ভর হিসেবে দেখা হয়। কারণ দেখা গেছে যেকোন শিশুকে যে কোন দেশে রেখে বড় করা হলে – সেই দেশের ভাষা রপ্ত করে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। জিনগত বৈশিষ্ট্য মূখ্য ভুমিকা পালন করলে এমনটি হতে পারতো না। তবে – পুরোপুরি জেনেটিক এবং পুরোপুরি পরিবেশ - এই দুই চরমসীমার মধ্যকার অধিকাংশ বিষয় আশয়কেই আসলে জিন এবং পরিবেশের সুষম মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

একই কথা মানব প্রকৃতি এবং মানুষের অর্জিত ব্যবহারের জন্যও খাটে। মানব প্রকৃতি গঠনে জিন যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি রাখে পরিবেশ। অনেক সময় প্রকৃতিকে পরিবেশ থেকে আলাদাও করা যায় না; আলাদা করার চেষ্টাও হয়ত অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। ম্যাট রিডলী তার 'এজাইল জিন' বইয়ে সেজন্যই বলেছেন –

> 'আমার কথা আরো একবার স্পষ্ট করে বলি। আমি মনে করি, মানুষের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে হলে প্রকৃতি এবং পরিবেশ দুটোকেই গোনায় ধরতে হবে। ... নতুন আবিস্কারের আলোকে বোঝা যাচ্ছে কিভাবে জিনগুলো মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে, আবার কিভাবে মানুষের ব্যাবহার জিনগুলোর প্রকাশভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। কাজেই বিষয়টা আর প্রকৃতি বনাম পরিবেশ (nature versus nurture) নয়, বরং পরিবেশ দিয়ে প্রকৃতি (nature via nurture)।

বংশানু আর পরিবেশ – আসলে আয়তক্ষেত্রের দুটি বাহুর মত। একটি দৈর্ঘ্য, আরেকটি প্রস্থ। মানব প্রকৃতি নির্মাণে কার ভূমিকা বেশি- জিন না পরিবেশ? এ পশ্ন কেউ করলে এর জবাব হবে - আয়তক্ষেত্র তৈরিতে কার ভূমিকা বেশি - দৈর্ঘ্য নাকি প্রস্থ?

সংস্কৃতির 'ভুত':

আগেই বলেছি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান সমাজ এবং সংস্কৃতির অনেক কিছু খুব পরিস্কার এবং বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করলেও এর অনেক উপসংহার এবং অনুসিদ্ধান্ত এতই বিপ্লবাত্মক যে এটি অবগাহন করা সবার জন্য খুব সহজ হয়নি, এখনো হচ্ছে না। এর অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে একটা কারণ আমাদের মধ্যেকার জমে থাকা দীর্ঘদিনের সংস্কার।

তবে ওটাই একমাত্র কারণ নয়। বিতর্কের মুল কারণ খুঁজলে দেখা যাবে, বিতর্কটা যতটা না সংস্কারের জন্য, তার চেয়ে অনেক বেশি বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত অনুকল্প আর এর থেকে পাওয়া বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্তের কারণে।

মূল বিতর্কটা নিঃসন্দেহে মানব মনের স্বরূপ নিয়ে। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা রঙ্গমঞ্চে হাজির হবার আগে সার্বজনীন 'মানব প্রকৃতি' বলে কিছু আছে কিনা সেটাই ঠিকমত আমাদের কাছে পরিস্কার ছিলো না। যেমন, স্প্যানিশ লিবারেল দার্শনিক হোসে ওর্তেগা গ্যাসেট মানব প্রকৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলতেন, 'Man has no nature, what he has is history'। ব্রিটিশ- আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ অ্যাশলে মন্টেগু বলতেন, 'মানুষের সহজাত

স্পৃহা (instinct) বলে কিছু নেই; কারণ তার সব কিছুই তার চারপাশের সমাজ- সংস্কৃতি থেকেই শেখা'। কেউ বা আবার মানব প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিলেও তাকে একেবারেই কাঁচামালের মত আদিম মনে করতেন। যেমন প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মার্গারেট মীড বলতেন, 'Human nature is the rawest, most undifferentiated of raw material'।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা এসে মানব প্রকৃতি নিয়ে এই প্রচলিত ছকটিকেই উলটে দিয়েছেন। ব্যাপারটা একটু খোলাসা করা যাক। একজন শৈলচিকিৎসক যখন হাসপাতালে অপারেশনের জন্য আসা কোন রোগীর পেটের ভিতর ছুরি চালাবেন বলে ঠিক করেন তখন তিনি জানেন যে, পেট কাটলে এর ভিতরে কি পাওয়া যাবে। পাকস্থলি, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি। পাকস্থলির জায়গায় পাকস্থলি থাকে, আর অগ্ন্যাশয়ের জায়গায় অগ্ন্যাশয়। অন্য রোগীর ক্ষেত্রেও পেট কেটে চিকিৎসক পাকস্থলির জায়গায় পাকস্থলি দেখবার প্রত্যাশাই করেন। এটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন রোগীর পাকস্থলিতে পার্থক্য থাকতে পারে – কারোটা মোটা, কারোটা চিকন, কারোটা দেখলেই হয়ত বোঝা যাবে ব্যাটা আমাশা রুগি, কারোটা আবার স্বাস্থ্যকর। বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, মানুষের পাকস্থলি দেখে কারো গরুর কিংবা ঘোড়ার পাকস্থলি বলে ভুল হবে না। কারণ মানুষের পাকস্থলির একটা প্রকৃতি আছে, যেটা গরুর পাকস্থলি থেকে আলাদা । আমি অবশ্য গরুর পাকস্থলি বিশেষজ্ঞ নই, যিনি বিশেষজ্ঞ – যেমন পলাশি বাজারের সলিমুল্লাহ কসাই- তিনি খুব ভাল করেই আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবেন গরুর পাকস্থলি কেমন হয়, খাসিরটা কেমন, ভেড়ারটা কেমন আর মুরগীরটা কেমন। ঠাটারিবাজারের নিত্যানন্দ কসাই হলে তার লিস্টে শুয়োরের পাকস্থলিও চলে আসতে পারে। সলিমুল্লা কিংবা নিত্যানন্দ কসাইয়ের অভিজ্ঞ চোখকে খাসির পাকস্থলির নামে শুয়োরের পাকস্থলি বলে চালানোর চেষ্টা করে ধোঁকা দেয়া যাবে না। কারণ তারা জানেন, খাসির পাকস্থলির প্রকৃতি শুয়োরেরটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। একই কথা মানুষের পাকস্থলির জন্যও প্রযোজ্য। একথা বলা ভুল হবে না যে, মানুষের পাকস্থলির প্রকৃতিই অন্যপ্রানীর পাকস্থলি থেকে তাকে আলাদা করে দিচ্ছে।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পেটের ভিতরে পাকস্থলির যেমন একটা প্রকৃতি আছে, তেমনি মানুষের মনেরও আলাদা একটা প্রকৃতি আছে – যেটা অন্য প্রানী থেকে আলাদা। উদাহরণ দেয়া যাক। মানুষের খুব কাছাকাছি প্রজাতি শিম্পাঞ্জী। শিম্পাঞ্জীর সাথে মানুষের জিনগত মিল শতকরা ৯৯ ভাগ। কাজেই ধরে নেয়া যায় শিম্পাঞ্জীর সাথে মানুষের অনেক কিছুতেই মিল থাকবে। কিন্তু যতই মিল থাকুক না কেন - সার্বজনীনভাবে মানব প্রকৃতি শিম্পাঞ্জীর প্রকৃতি থেকে আলাদা হবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি, অনেকটা উপরের উদাহরণের পাকস্থলির প্রকৃতির মতই। কিছু উদাহরণ হাজির করি। শিম্পাঞ্জী সমাজে মেয়ে শিম্পাঞ্জীরা বহুগামী হয় – তারা যত ইচ্ছা ছেলেদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন

করে – তাদের আসলেই কোন বাছ বিচার নেই। পুরুষ শিম্পাঞ্জীরা আবার অন্য মেয়ে শিম্পাঞ্জী (যাদের সাথে এখনো দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই) – তাদের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। এ ধরণের কোন প্যাটার্ন আমাদের মানব সমাজে চোখে পড়ে না। চোখে না পড়াই স্বাভাবিক, কারণ মানুষের প্রকৃতি শিম্পাঞ্জীদের প্রকৃতি থেকে আলাদা।

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীদের কথামত আমরা জানলাম 'মানব প্রকৃতি' বলে একটা কিছু তাহলে আছে, যেটা অন্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। কিন্তু কেমন সে প্রকৃতি? সমাজ বিজ্ঞানী কিংবা নৃতাত্ত্বিকরা অনেকদিন ধরেই এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন। তারা বলেন এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে মানব সমাজের সংস্কৃতিতে। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এমিল ডার্খেইম কোন সার্বজনীন মানব প্রকৃতির জন্মগত প্রকরণকে অস্বীকার করে তাকে ব্ল্যাঙ্ক স্লেটের সাথে তুলনা করেছিলেন। তার মতে সাংস্কৃতিক বিভাজনই মানব প্রকৃতিকে তুলে ধরার একমাত্র নিয়ামক। কাজেই মানব প্রকৃতি বিষয়ে যে প্রশ্নই করা হোক না কেন – এর উত্তর আমাদের খুঁজে নিতে হবে সংস্কৃতিতে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি সহিংস কেন - এর উত্তর হল - সংস্কৃতিই এর কারণ। ছেলেরা কেন সত্তুর বছরের বুড়ির চাইতে বিশ বছরের ছুঁড়ির প্রতি বেশি আকর্ষিত বোধ করে কিংবা লালায়িত হয় – এর উত্তর হচ্ছে সংস্কৃতি। ছেলেরা কেন মেয়েদের চেয়ে বেশি পর্ণগ্রাফি দেখে, কিংবা বহুগামী – উত্তর একটাই – 'সংস্কৃতি'! *Omnia cultura ex cultura*!

সমাজবিজ্ঞানের পুরোধা এমিল ডার্খেইম যে ইটের গাথুঁনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাতে 'সংস্কৃতির প্রাসাদ' বানাতে এবারে এগিয়ে এলেন নৃতাত্ত্বিকেরা। নৃতত্ত্ববিদের জনক বলে যাকে অভিহিত করা হয় সেই - ফ্রানজ বোয়া এবং মার্গারেট মীড ছিলেন এদের মূল কান্ডারী। ফ্রানজ বোয়া যে মতবাদ প্রচার করলেন তাতে সকলের মনে হল, মানুষের প্রকৃতি বুঝি একেবারেই নমনীয়। এতে জন্মগত কোন বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ নেই, কোনদিন ছিলোও না। সব কিছুই সংস্কৃতিনির্ভর। আর বোয়ার প্রিয় ছাত্রী 'নৃতত্ত্বের রাণী' মার্গারেট মীড আদিম 'স্যামোয়া' জাতির মেয়েদের নিয়ে এমন এক আদর্শিক সমাজ কল্পণা করে ফেললেন, যার বাস্তব অস্তিত্ব আসলে পৃথিবীর কোথাওই নেই। মীডের 'স্যামোয়া' যেন আক্ষরিক অর্থেই হচ্ছে স্বর্গের প্রতিরূপ। সেখানে কারো মধ্যে নেই কোন ঝগড়া, নেই কোন ঘৃণা, ঈর্ষা কিংবা হিংসা। যৌনতার ক্ষেত্রে তাদের আচরণ একেবারে স্বতস্ফুর্ত। সেখানকার মেয়েরা বহুগামী, যৌনতার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন – যখন ইচ্ছে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রিয় মানুষের সাথে সম্পর্ক করে নিতে পারে। তারা স্বাধীনভাবে যেটা চায় সেটা করতে পারে। মীডের অনুকল্প ছিলো, স্যামোয়া জাতির সংস্কৃতিই তাদের মেয়েদের এমন স্বতস্ফুর্ত আর স্বাধীন করে তুলেছে। এ থেকে মীড সিদ্ধান্তে আসেন, বংশগতি নয় বরং সংস্কৃতিই ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। মার্গারেট মীড তার চিন্তাধারা ব্যক্ত করে ১৯২৮ সালে 'Coming of Age in Samoa' নামের যে গ্রন্থ রচনা

করেন সেটি 'সংস্কৃতিভিত্তিক প্রাসাদের' এক অগ্রগন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় (প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, মুক্তান্বেষার প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় মার্গারেট মীডকে নিয়ে ফরিদ আহমেদের একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে) । কিন্তু পরবর্তীতে ডেরেক ফ্রিম্যানসহ অন্যান্য গবেষকদের গবেষণায় প্রমানিত হয় যে, মীডের অনুকল্পগুলো স্রেফ 'উইশফুল থিংকিং' ছাড়া আর কিছু ছিলো না। গবেষকেরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, মীডের গবেষণা ছিলো একেবারেই সরল এবং মীড স্যামোয়ান মেয়েদের দ্বারা নিদারূণভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। ফ্রিম্যানের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এলো, স্যামোয়ান্ জাতির মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ, ঘৃণা, হত্যা লুন্ঠন- আর দশটা জাতির মতই প্রবলভাবে বিদ্যমান, সরলমনা মীড সেগুলো দেখতেই পাননি। সেজন্যই ম্যাট রীডলী তার 'এজাইল জিন' বইয়ে মীডের গবেষণা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, 'Her failure to discover the cultural determinism of human nature is like the dog that failed to bark'।

আসলে সংস্কৃতির বিভাজনের কথা ঢালাও ভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতিতে আর নৃতত্ত্বে উল্লিখিত হয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় এই বিভাজন মোটেই বস্তুনিষ্ঠতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় না। ব্যাপারটা নৃতত্ত্ববিদ আর সমাজবিদদের জন্য এক নিদারূন লজ্জার ব্যাপার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সংস্কৃতির যত বিভাজনই থাকুক না কেন, প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই দেখা যায়, মানুষেরা একইভাবে রাগ অনুরাগ, হিংসা, ক্রোধ প্রকাশ করে থাকে। পশ্চিমা বিশ্বের আলো ঝলমলে তথাকথিত 'আধুনিক' সভ্যতা থেকে শুরু করে পৃথিবীর আনাচে কানাচে যত গহীন অরন্যের যত নাম না জানা গোত্রের মধ্যেই অনুসন্ধান করা হোক না কেন – দেখা যাবে নাচ, গান, ছবি আঁকার ব্যাপারগুলো সব সংস্কৃতিতেই কম বেশি বিদ্যমান। কেউ হয়ত গুহার পাথরে হরিণ শিকারের ছবি আঁকছে, কেউ পাথরে খোদাই করে মূর্তি বানাচ্ছে, কেউ নদীর ধারে বসে পাল তোলা নৌকাকে ক্যানভাসে উঠিয়ে আনছে, কেউবা আবার মাটির পটে গড়ে তুলছে অনবদ্য শিল্পকর্ম। সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান যোগ হবার কারণে ব্যক্তি কিংবা সংস্কৃতিভেদে চিত্রকল্পের প্রকাশ ভঙ্গিতে হয়ত পার্থক্য আছে কিন্তু চিত্র প্রকাশের বিমূর্ত স্পৃহাটি সেই একই রকম থেকে যাচ্ছে। শুধু ছবি আঁকা নয়, নাচ- গানের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখব। এক দেশে কেউ একতারা হাতে বাউল গান গেয়ে চলছে তো আরেকজন অন্য দেশে নিবিষ্ট মনে পিয়ানো বাজিয়ে চলছে। কেউবা চোখ মুদে সেতার বাজাচ্ছে তো কেউবা গিটার কিংবা কেউ সন্তুর। যে একেবারেই আলসে সে হয়ত পড়াশুনা করার টেবিকেই ঢোল বানিয়ে তাল ঠুকছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সাথে। এক সংস্কৃতিতে কেউ হয়ত ডিস্কো নাচ নাচছে, অন্য জায়গায় সেরকমই একজন কেউ ভরত নাট্যম, আরেক জায়গায় কেউ ল্যাটিন ফিউশন, কেউবা কোন অচেনা ট্রাইবাল ড্যান্স। নাচের রকম ফেরে কিংবা মূদ্রায় পার্থক্য থাকলেও সংস্কৃতি নির্বিশেষে নাচ- গানের অদম্য স্পৃহাটি কিন্তু এক সার্বজনীন মানব প্রকৃতিকেই উর্ধ্বে তুলে ধরছে। এই ব্যাপারটির তাৎপর্য উপলব্ধি করেই ডি. ই ব্রাউন তার 'Human

Universals' গ্রন্থে বলেছেন – 'It is the human universals not the differences that are truly intriguing'।

নারী ও পুরুষ:

আধুনিক বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা আরো বলেন, ডারউইনের 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' বা 'যৌনতার নির্বাচন' বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রেখে থাকে তবে এর একটি প্রভাব আমাদের দীর্ঘদিনের মানসপট নির্মাণেও অবশ্যাম্ভাবীরূপে পড়বে। যৌনতার উদ্ভবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী- পুরুষ একই মানব প্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়ছে এক ধরণের মনোদৈহিক পার্থক্য – জৈববৈজ্ঞানিক পথেই। নারীদের জননতন্ত্রের প্রকৃতি পুরুষদের জননতন্ত্র থেকে আলাদা। মেয়েদেরকে যে ঋতুচক্র, নয়মাস ব্যাপী গর্ভধারণসহ হাজারো ঝুট- ঝামেলা পোহাতে হয় – পুরুষদের সেগুলো কোনটিই করতে হয় না। একটি পুরুষ, তাত্ত্বিকভাবে হলেও যে কোন সময়ে এই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য নারীর গর্ভে অসংখ্য সন্তানের জন্ম দিতে পারে (কুখ্যাত চেঙ্গিস খানের মত কেউ কেউ সেটা করে দেখিয়েছেও)। কিন্তু একটি মেয়ে একবছরে শুধু একটি পুরুষের শুক্রানু দিয়েই গর্ভ নিশ্চিত করতে পারে – এর বেশি নয়। আসলে কেউ যদি বলেন, জৈববৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিচার করলে যৌনতার উদ্ভবই হয়েছে আসলে নারী- পুরুষে পার্থক্য করার জন্য – এটা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। এই পার্থক্যের প্রভাব ছেলে মেয়েদের মানস জগতেও পড়েছে, পড়েছে সমাজেও। কোন গবেষকই এখন অস্বীকার করেন না যে যৌনতার বিভাজন নারী পুরুষে গড়ে দিয়েছে বিস্তর পার্থক্য – শুধু দেহ কাঠামোতে নয়, তার অর্জিত ব্যবহারেও। সেজন্যই গবেষক ডোনাল্ড সিমন্স বলেন,

> 'Men and women differ in sexual natures because throughout the immensely long haunting and gathering phase of evolutionary history of sexual desires and dispositions that were adaptive for either sex were for either sex were for the other tickets to reproductive oblivion.'।

মানব সভ্যতার যে কোন জায়গায় খোঁজ নিলে দেখা যায় - ছেলেরা সংস্কৃতি নির্বিশেষে মেয়েদের চেয়ে চরিত্রে বেশি 'ভায়োলেন্ট' বা সহিংস হয়ে থাকে, মেয়রা বাচনিক যোগাযোগে (ভার্বাল কমিউনিকেশন) ছেলেদের চেয়ে বেশি পরিপক্ক হয়। 'পলিগামি' বা বহুগামীত্বের ব্যাপারটা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অধিকতর প্রবলভাবে দৃশ্যমান। সম্পর্কের মধ্যে প্রতারণা বা 'চিট্' ব্যাপারটাও কিন্তু মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি করে থাকে। আবার মেয়েরা প্রতারণা ধরতে অধিকতর দক্ষ। পর্নোগ্রাফির প্রতি আকর্ষণ মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে বেশি। কিন্তু মেয়েরা আবার ছেলেদের তুলনায় 'লাভ

স্টোরির'র বেশি ভক্ত। সিরিয়াল কিলারের সংখ্যা ছেলেদের মধ্যে বেশি, মেয়েদের মধ্যে খুবই কম । সংস্কৃতি নির্বিশেষে পুরুষদের টাকা পয়সা, স্ট্যাটাস ইত্যাদর মাপকাঠিতে বিচার করা হয়, আর মেয়েদের সৌন্দর্যের। নৃতত্ত্ববিদ মেলভিন কনোর খুব পরিস্কার করেই বলেন –

> 'ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি সহিংস, আর মেয়েরা অনেক বেশী সংবেদনশীল – অন্ততঃ শিশু এবং নাবালকদের প্রতি। এই ব্যাপারটা উল্লেখ করলে একে যদি 'গতানুগতিক কথাবার্তা' (cliché) বলে কেউ উড়িয়ে দিতে চান – সেটা এ সত্যকে কিছুমাত্র দমন করবে না'।

ব্যাপারগুলো সঠিক নাকি ভুল, কিংবা 'উচিৎ' নাকি 'অনুচিৎ' সেটি এখানে বিচার্য নয়, বিচার্য হচ্ছে আমাদের সমাজ কেন এইভাবে গড়ে উঠেছে - যে সংখ্যাগরিষ্ট মন মানসিকতা একটি নির্দিষ্ট ছকে সবসময় আবদ্ধ থাকে? এখানেই মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান যতটা সফল, সমাজবিজ্ঞান ততটা নয়।

কেন সংস্কৃতি- নির্বিশেষে ছেলেরা সম্পর্কের মধ্যে থাকা অবস্থায় তার সঙ্গীর সাথে বেশি প্রতারণা করে কিংবা কেন পর্ণগ্রাফির বেশি ভক্ত - এটি জিজ্ঞাসা করলে সমাজবিজ্ঞানী কিংবা নারীবাদীদের কাছ থেকে নির্ঘাত উত্তর পাওয়া যাবে যে, যুগ যুগ ধরে মেয়েদের সম্পত্তি বানিয়ে রাখা হয়েছে, তারা শোষিত - এই মনোবৃত্তি তারই প্রতিফলন। কিন্তু যে সমস্ত সমাজে ছেলে- মেয়েদের পার্থক্যসূচক মনোভাবের মাত্রা কম - সেখানে কি তাহলে এ ধরণের ঝোঁক নেই? না তা মোটেও নয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে ইসরায়েলের কিবুৎজ (Kibbutz) শহরের একটি পরীক্ষামূলক গবেষণায়। সমাজে বিদ্যমান সমস্ত রীতি বা ট্যাবু আসলে জন্মগত নয়, বরং সংস্কৃতি থেকেই উদ্ভুত – এই ধারণা থেকে সেখানকার অধিবাসীরা ঠিক করেছিলো সমস্ত যৌনতার প্রভেদমূলক পার্থক্যকে ওই শহর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে। তার প্রক্রিয়া হিসেবে সেখানকার মেয়েদেরকে ছেলেদের মত ছোট ছোট চুল রাখতে উৎসাহিত করা হল, আর ছেলেদেরকে সেখানো হল সহিংসতা ত্যাগ করে কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা যায়! যে সমস্ত মেয়েরা 'টম বয়' হয়ে জীবন কাটাতে চায়, তাদের পিঠ চাপরে সাধুবাদ জানানো হল, ছেলেরা যেন ঘরের কাজ আর মেয়েরা যেন বাইরের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে সেজন্য যথাযথ ট্রেনিং- এর ব্যবস্থা করা হল। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কিবুৎজ সে সময় গন্য হয়েছিল আদর্শবাদীদের স্বর্গ হিসেবে – যেখানে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। কিন্তু তিন প্রজন্ম পরে দেখা গেল সেই 'আদর্শ' কিবুৎজ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে সেক্সিস্ট বা যৌনবৈষম্যবাদী শহর হিসেবে। সেখানকার মানুষজন আদর্শবাদীদের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করে ফিরে গিয়েছিলো সেই চিরন্তন গৎবাধা জীবনে। অভিভাবকদের আদর্শবাদী নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল পরবর্তী

প্রজন্মের সন্তানেরা। ছেলেরা দেখা গেল, অভিভাবকদের দেখিয়ে দেয়া পথ অস্বীকার করে বেশি পদার্থবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গনিত পড়তে শুরু করেছে, মেয়েরা বেশি যাচ্ছে মেডিকেলে। তারা নার্সিং- এ কিংবা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি। ছেলেদের ঘরের কাজ করার যে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু দেখা গেল মেয়েরাই শেষপর্যন্ত ঘর দোর গোছানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। দায়িত্ব তুলে নেয়ার পেছনে কারণ হিসবে তারা বলল, 'আরে ছেলেরা ঠিকমত বাসাবাড়ি পরিস্কার রাখতে পারে না'। আর অন্যদিকে ছেলেরা বললো, 'আরে যত ভালভাবেই করি না কেন বউয়ের মর্জি মাফিক কিছুতেই হয় না'। ব্যাপারটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, এ ধরণের বিভক্তিগুলোকে যতই অস্বীকার করে সাম্যের পথে সমাজকে ঠেলে দেয়া হয়, বিদ্যমান জৈববৈজ্ঞানিক পার্থক্যগুলো সে সমাজে তত প্রকট হয়ে উঠে। ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয়।

চাহিদায় পার্থক্য, পার্থক্য মানসিকতাতেও

মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে, ছেলে মেয়েদের পারস্পরিক চাহিদা পছন্দ, অপছন্দে যেমন মিল আছে, তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে আছে চোখে পড়ার মতই পার্থক্য। এটা হবার কথাই। নারী পুরুষ উভয়কেই সভ্যতার সূচনার প্রথম থেকেই ডারউইন বর্নিত 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' নামক বন্ধুর পথে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে হয়েছে, শুধু দৈহিকভাবে নয় মন মানসিকতাতেও। দেখা গেছে, ছেলেরা আচরণগত দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে অনেক প্রতিযোগিতামূলক (competitive) হয়ে থাকে। ছেলেদের স্বভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়েছে কারণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে বাঁচতে হয়েছে আদি কাল থেকেই। যারা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পেরেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষদের এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতাকে একটু চেষ্টা করলেই ধরা যাবে। একটা মজার উদাহরণ দেই। আমেরিকার একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে পরিবার নিয়ে লং ড্রাইভিং –এ বেড়িয়ে কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে দেখে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে বড়জোর ল্যান্ডমার্ক, ম্যাপের দারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না । আর অন্যদিকে মেয়েরা প্রথমেই গাড়ী থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে পুরুষেরা গাড়ী থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 'আত্মভরি' মানসিতার কারণে ব্যাপারটাকে তারা 'যুদ্ধে পরাজয়' হিসবে বিবেচনা করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের মানসপটে এত প্রবলভাবে রাজত্ব করে না বলে তারা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে সমাধানে পৌঁছুতে উদগ্রীব থাকে। শুধু ড্রাইভিংই একমাত্র উদাহরণ নয়; পুরুষেরা অর্থ, বিত্ত আর সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতি যে বেশি আকৃষ্ট তা যে কোন সমাজেই প্রযোজ্য। এটাও এসেছে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা থেকে।

এখন কথা হচ্ছে, পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে কেন বেশি সহিংস কিংবা কেন তাদের মন মানসিকতা এত বেশী প্রতিযোগিতামূলক হয়ে গড়ে উঠেছে? বিবর্তনীয় বিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিলো হান্টার বা শিকারী, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক। প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরী বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসবে চিহ্নিত করা হত। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে আর সম্পত্তি আর নারীর দখল নিতে। এখনো এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়ছেন ভেনিজুয়ালার আদিম ট্রাইব ইয়ানোমামো (Yąnomamö)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই ট্রাইব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ্য করেন,

> ‘এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করেনা, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও’।

দেখা গেল ট্রাইবে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর- দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

ছবি - ইয়ানোমামো গোত্রের পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম আক্রমনের আগে এভাবেই সমরশিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রদর্শন করে থাকে। (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, গবেষকরা ইতিহাসের পাতা পর্যালোচনা আর বিশ্লেষন করে বলেন, বিশেষতঃ প্রাককৃষিপূর্ব সমাজে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল। পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনো চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে - প্রতিটি যুদ্ধেই দেখা যায় অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরান সহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

এদিকে পুরুষেরা যখন হানাহানি মারামারি করে তাদের ‘পুরুষতান্ত্রিক’ জিঘাংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্য দিকে, মেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছে সংসার গোছানোর। গৃহস্থালীর পরিচর্যা মেয়েরা বেশি অংশগ্রগণ করায় তাদের বাচনিক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ধিত হয়েছে। একটি ছেলের আর মেয়েদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত যে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাতে বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক প্রমাণিত হয় । ছেলেদের ব্রেনের আকার গড়পরতা মেয়েদের মস্তিস্কের

চেয়ে অন্ততঃ ১০০ গ্রাম বড় হয়, কিন্তু ওদিকে মেয়েদের ব্রেন ছেলেদের চেয়ে অনেক ঘন থাকে। মেয়েদের মস্তিস্কে কর্পাস ক্যালোসাম এবং এন্টেরিয়র কমিসুর নামক প্রত্যঙ্গ সহ টেম্পোরাল কর্টেক্সের যে এলাকাগুলো ভাষা এবং বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেগুলো ছেলেদের চেয়ে অন্ততঃ ২৯ ভাগ বিবর্ধিত থাকে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মস্তিস্কে রক্তসঞ্চালনের হার ছেলেদের ব্রেনের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি থাকে।

মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের প্রভাব পড়ে তাদের অর্জিত ব্যবহারে, আর সেই ব্যবহারের প্রভাব আবার পড়ে সমাজে। অভিভাবকেরা সবাই লক্ষ্য করেছেন, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক আগে কথা বলা শিখে যায় - একই রকম পরিবেশ দেয়া সত্ত্বেও। ছেলেদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো গড়পড়তা মেয়েদের মত উন্নত না হওয়ায় ডাক্তাররা লক্ষ্য করেন পরিণত বয়সে ছেলেরা সেরিব্রাল পালসি, ডাইলেক্সিয়া, অটিজম এবং মনোযোগ- স্বল্পতা সহ বিভিন্ন মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের আরো পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ছেলেরা যখন কাজ করে অধিকাংশ সময়ে শুধু একটি কাজে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, এক সাথে চার পাঁচটা কাজ করতে পারে না, প্রায়শই গুবলেট করে ফেলে। আর অন্যদিকে মেয়েরা অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে ছয় সাতটা কাজ একই সাথে করে ফেলে। এটাও হয়েছে সেই হান্টার –গ্যাদারার পরিস্থিতি দীর্ঘদিন মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই। শিকারী হবার ফলে পুরুষদের স্বভাবতই শিকারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হত, ফলে তাদের মানসজগত একটিমাত্র বিষয়ে ‘ফোকাসড্’ হয়ে গড়ে উঠেছিল, আর মেয়েদের যেহেতু ঘরদোর সামলাতে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাজারটা কাজ করে ফেলতে হত, তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল একাধিক কাজ একসাথে করাতে।

আরো কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যাক। ছেলেদের মস্তিস্কের প্যারিয়েটাল কর্টেক্সের আকার মেয়েদের মস্তিস্কের চেয়ে অনেক বড় হয়। বড় হয় অ্যামাগদালা নামের বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গের আকারও । এর ফলে দেখা গেছে ছেলেরা জ্যামিতিক আকার নিয়ে নিজেদের মনে নাড়াচাড়ায় মেয়েদের চেয়ে অনেক দক্ষ হয়। তারা একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে সামনে থেকে দেখেই নিজেদের মনের আয়নায় নড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে বুঝে নিতে পারে বস্তুটি, পেছন থেকে, নীচ থেকে বা উপর থেকে কিরকম দেখাতে পারে। জরিপ থেকে দেখা গেছে, ছেলেরা গড়পরতা বিমূর্ত এবং ‘স্পেশাল’ কাজের ব্যাপারে বেশী সাবলীল, আর মেয়েরা অনেক বেশী বাচনিক এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে।

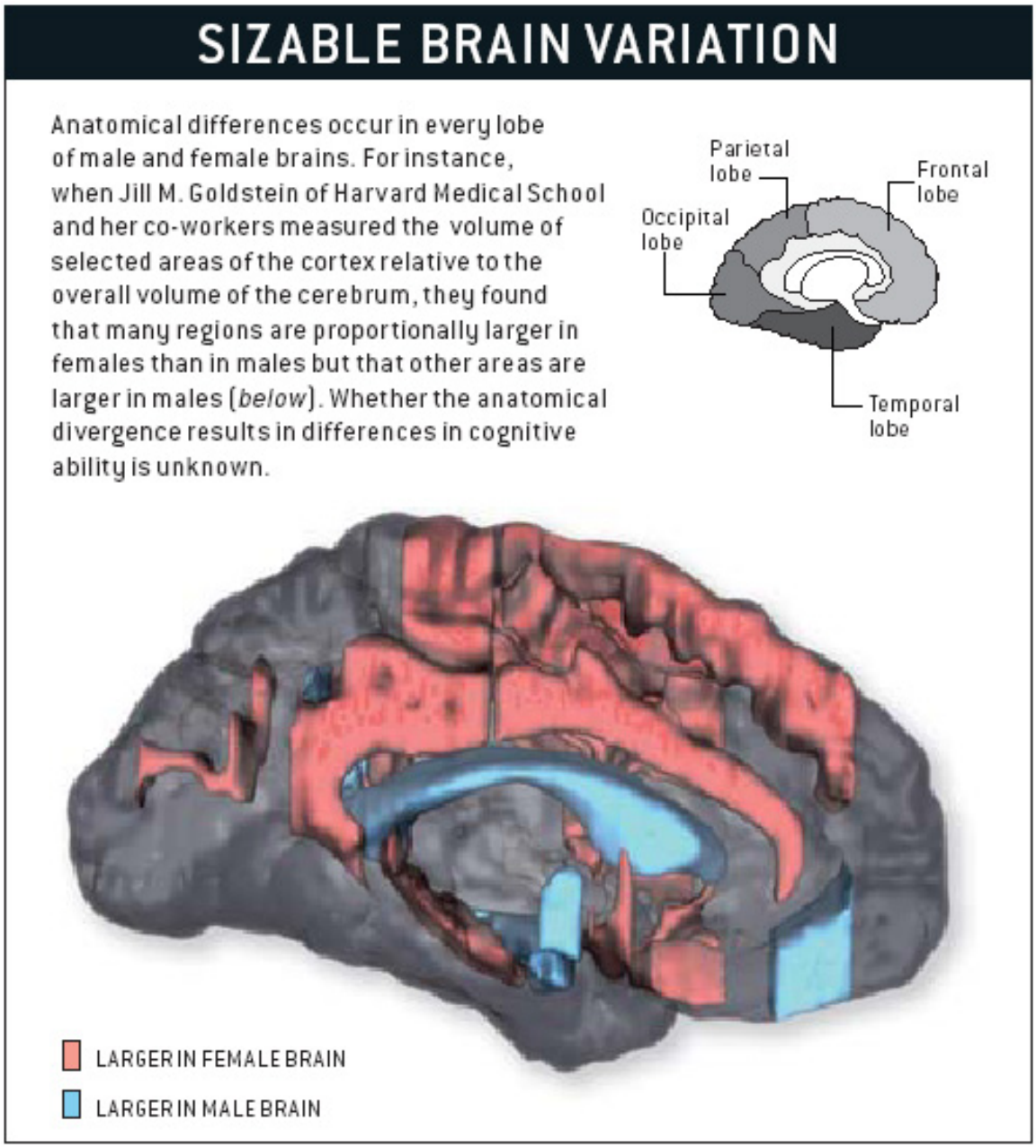

ছবি – বিজ্ঞানীরা ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

হয়ত এজন্যই ছেলেরা অধিক হারে স্থাপত্যবিদ্যা কিংবা প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে উৎসুক হয়, আর মেয়েরা যায় শিক্ষকতা, নার্সিং, কিংবা সমাজবিদ্যায়। এই ঝোঁক সংস্কৃতি এবং সমাজ নির্বিশেষে একই রকম দেখা গেছে। এই রকম সুযোগ দেয়ার পরও বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা বড় হয়ে বুয়েটের চেয়ে মেডিকেলে পড়তেই উদগ্রীব থাকে। কোন সংস্কৃতিতেই ছেলেরা খুব একটা যেতে চায় না নার্সিং- এ, মেয়েরা যেমনিভাবে একটা

‘গ্যারেজ মেকানিক’ হতে চায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই । এটা কি কেবলই মেয়েরা শোষিত কিংবা পিছিয়ে পড়া বলে, নাকি বিবর্তনীয় ‘সিলেকশন প্রেশার’ তাদের মধ্যে অজান্তেই কাজ করে বলে?

সব টাকমাথা পয়সাওয়ালা লোকের ঘরে সুন্দরী বউ দেখি কেন?

কলেজ জীবনে ক্লাস ‘বাং মেরে’ নিউমার্কেটে ঘুরার অভিজ্ঞতা বোধ হয় কমবেশি সব ছাত্রেরই আছে। আমারও ছিলো পুরোমাত্রায়। একটা পুরো গ্যাং নিয়ে চলে যেতাম। ওই গ্যাং এর একটা অংশ আবার সুন্দর মেয়ে দেখায় সদা ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু দেখলে কি হবে, পোড়া কপাল, যত বেশি সুন্দরী মেয়ে – তত বেশী টাক মাথা, বয়স্ক, হোদল কুৎকুতে স্বামী নিয়ে ঘুরছে। শেষ মেষ এমন হল যে, টাকমাথা ‘আবলুস বাবা’ টাইপের কাউকে বলিউডের নাকিয়াদের মত মেয়ে নিয়ে ঘুরতে দেখলেই আমরা ধরে নিতাম – ব্যাটার হয় ম্যালা পয়সা, নইলে ব্যাটা সমাজে বিরাট কেউকেটা কেউ হবে। মজার ব্যাপার হল - পরে দেখা যেত আমাদের অনুমান নির্ভুল হত প্রায় সবক্ষেত্রেই। আসলে ক্ষমতাবান পুরুষেরা যে সুন্দরী তরুনীদের প্রতি বেশি লালায়িত হয়, আর সুন্দরীরা পয়সা আর স্ট্যাটাসওয়ালা স্বামীর প্রতি – এটা সব সমাজেই এত প্রকট যে এটা নিয়ে গবেষণা করার কেউ প্রয়োজনই বোধ করেননি কখনো। এজন্যই ন্যান্সি থর্নহিল বলেন,

> ‘Surely no one has ever seriously doubted that men desire young, beautiful women, and that women desire wealthy high status men’.

কিন্তু সনাতন সমাজবিজ্ঞানীরা আপত্তি করেছেন। তাদের অনুমান ছিলো সব সংস্কৃতিতে নিশ্চয় এ ধরণের ‘স্টেরিওটাইপিং’ নেই। এখন এদের অনুমান সঠিক না কি ভুল তা পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বাস। তিনি ৩৩ টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা গড়পরতা দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে, কিন্তু পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুন্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়ারাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস। অধ্যাপক বাস প্রথমে আমেরিকায় সমীক্ষা চালালেন। দেখা গেল, আমেরিকায় মেয়েরা যত ভাল চাকরীই করুক না কেন, তারা আশা করে তার স্বামী তাদের চেয়ে বেশি রোজগার করবে – নাইলে ব্যাপারটা ‘এনাফ কুল্’ হবে না। ম্যাচ ডট কম –এর মত সাইটগুলোতে দেখা যায় মেয়েরা তার হবু সঙ্গীর স্ট্যাটাস এবং প্রতিপত্তির প্রতি আগ্রহী হয় ছেলেদের চেয়ে ১১ গুন বেশি। এমনকি একটি পরীক্ষায় অধ্যাপক বাস একই লোককে কখনো বার্গার কিং বা ম্যাকডোনাল্ডসের কর্মীর পোষাক পরিয়ে, কখনোবা বিরাট কোন কোম্পানির সিইও সাজিয়ে পরীক্ষা করলেন । দেখা গেল, নিম্ন স্ট্যাটাসের পোশাক পরা লোকের সাথে

মেয়েরা প্রাথমিকভাবে কোন ধরণের সম্পর্ক করতেই রীতিমত অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অথচ একই লোককে বড় স্ট্যাটাসের কোন পোশাক পরিয়ে বাইরে নেয়া হলেই মেয়েরা তার প্রতি উৎসুক হয়ে উঠছে। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে সেরকম প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি। অর্থাৎ, ছেলেরা সঙ্গি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়েদের স্ট্যাটাস নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন নয়, যতটা তারা উদ্বিগ্ন একটি মেয়ের দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে। প্রথমে যখন বাসের ফলাফল বৈজ্ঞানিক সাময়ীকিতে প্রকাশিত হল, সেটা উড়িয়ে দেয়া হল এই বলে – আরে ওটা আমেরিকার পঁচে যাওয়া ভোগবাদী সংস্কৃতির নিদর্শন। অন্য জায়গায় নিশ্চয় এরকম হবে না। অন্য জায়গার ঘটনা বুঝতে বাস ইউরোপীয় দেশগুলোতে তার সমীক্ষা চালালেন। সেখানেও একই ধরণের ফলাফল বেড়িয়ে আসলো – ছেলেরা মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রতি বেশি মনোযোগী, আর মেয়েরা ছেলেদের স্ট্যাটাসের- তা সে হল্যান্ডেই সমীক্ষা চালান হোক, অথবা জার্মানীতে। এবারে বলা হল ইউরোপীয় সংস্কৃতি অনেকটা আমেরিকার মতই। সেখানে তো এরকম ফলাফল আসবেই। এরপর অধ্যাপক বাস ছয়টি মহাদেশ এবং পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের ৩৭ টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা ১০০৪৭ জন লোকের উপর সমীক্ষা চালালেন – একেবারে আলাস্কা থেকে শুরু করে সেই জুলুল্যান্ড পর্যন্ত। প্রতিটি সংস্কৃতিতেই দেখা গেল মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আর্থিক প্রতিপত্তিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে [***]। জাপানে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশী পাওয়া গেল আর হল্যান্ডে সবচেয়ে কম – কিন্তু তারপরেও সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারী- পুরুষের চাহিদার পার্থক্য কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

নারীপুরুষের এ ধরণের চাহিদার পার্থক্য আরো প্রকট হয়েছে নারী- পুরুষদের মধ্যকার যৌনতা নিয়ে 'ফ্যান্টাসি' কেন্দ্রিক গবেষনাগুলোতেও। ব্রুস এলিস এবং ডন সিমন্সের করা ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে যে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যকার যৌনতার ব্যাপারে ফ্যান্টাসিগুলো যদি সততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে যৌনতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে, এমনকি সারা জীবনে তাদের পার্টনারের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কল্পনা করে তারা আমোদিত হয়ে উঠে- আর মেয়েদের মধ্যে সে সংখ্যাটা মাত্র ৮ ভাগ। এলিস এবং সিমন্সের সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অর্ধেক সংখ্যক নারীরা অভিমত দিয়েছে, যৌনতা নিয়ে কল্পনার উন্মাতাল সময়গুলোতেও তারা কখনো সঙ্গী বদল করে না, অন্য দিকে পুরুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা মাত্র ১২ ভাগ। মেয়েদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো তার নিজের পরিচিত যৌনসঙ্গিকে কেন্দ্র করেই সবসময় আবর্তিত হয়, আর অন্যদিকে পুরুষদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো সময় সময় সম্পূর্ণ

[***] Buss, D.M., 1989. Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49.

অপরিচিত মেয়েকে নিয়েও উথলে ওঠে । একারণেই গবেষক এলিস এবং সিমন্স তাদের গবেষণাপত্রে এই বলে উপসংহার টেনেছেন [†††] –

> ‘পুরুষদের যৌনতার বাঁধন- হারা কল্পনাগুলো হয়ে থাকে সর্বব্যাপী, স্বতঃস্ফুর্ত, দৃষ্টিনির্ভর, বিশেষভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক, নির্বিচারী, বহুগামী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে মেয়েদের যৌন অভিলাস অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক, আবেগময়, অন্তরংগ এবং অক্রিয়।’

ছেলে মেয়েদের যৌন- অভিলাসের পার্থক্যসূচক এই প্রবণতার প্রভাব পড়েছে আজকের দিনের বানিজ্যে এবং পন্য- দ্রব্যে। এমনি একটি দ্রব্য হচ্ছে ‘পর্নগ্রাফি’ অন্যটি হল ‘রোমান্স নভেল’। পর্নগ্রাফির মুল ক্রেতা নিঃসন্দেহে পুরুষ। পুরুষদের উদগ্র এবং নির্বিচারী সেক্স ক্রেজের চাহিদা পূর্ণ করতে বাজার আর ইন্টার্নেট সয়লাব হয়ে আছে সফট পর্ন, হার্ড পর্ন, থ্রি সাম, গ্রুপ সেক্স সহ হাজার ধরণের বারোয়ারি জিনিসপত্রে। এগুলো পুরুষেরাই কিনে, পুরুষেরাই দেখে। মেয়েরা সে তুলনায় কম। কারণ, মেশিনের মত হার্ডকোর পর্ন পুরুষদের তৃপ্তি দিলেও মেয়েদের মানসিক চাহিদাকে তেমন পুর্ণ করতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর নগ্ন দেহ দেখে পুরুষেরা যেমন সহজেই আমোদিত হয়, মেয়েরা তেমনি হয় না। কারণ - মেয়েদের অবারিত সেক্স জাগ্রত করতে দরকার অবারিত ইমোশন!

আর মেয়েদের এই ‘অবারিত ইমোশন’ তৈরি করতে বাজারে আছে ‘রোমান্স নভেল’। এই রোমান্টিক নভেলের মূল ক্রেতাই নারী। দেদারসে প্রেম- পীরিতি- বিচ্ছেদের পসরা সাজিয়ে শ’য়ে শ’ইয়ে বই সাড়া দুনিয়া জুড়ে বের করা হয় – আর সেগুলো দেদারসে বিক্রি হতে থাকে সাড়া বছর জুড়ে, মূলতঃ মেয়েদের হাত দিয়ে। বাংলাদেশে যেমন আছে ইমদাদুল হক মিলন, তেমনি আমেরিকায় সুসান এলিজাবেদ ফিলিপ্স, ভারতে তেমনি সুবোধ ঘোষ কিংবা নীহারঞ্জন গুপ্ত । প্রেম কত প্রকার ও কি কি তা বুঝতে হলে এদের উপন্যাস ছাড়া গতি নেই। আমি শুনেছি, রোমান্স নভেলের জন্য প্রকাশকেরা ইদানিংকালে বিশেষতঃ ঊঠতি লেখকদের নাকি বলেই দেয় – কিভাবে তার উপন্যাস ‘সাজাতে’ হবে, আর কি কি থাকতে হবে। একটু প্রেম, অনুরাগ, কমিটমেন্ট, মান – অভিমান, বিচ্ছেদ, ক্লাইম্যাক্স তারপর মিলন। আবেগের পশরা বেশি থাকতে হবে, সে

[†††] B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary Psychological Approach", *Journal of Sex Research*, Vol. 27 pp.527 - 555.

তুলনায় সেক্সের বাসনা কম। বইয়ের নায়িকার সেক্সের সাথে আবার ইমোশন মিলিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি। এভাবে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে রোমান্স নভেলের ম্যানুফ্যাকচারিং। মেয়েরা দেদারসে কিনছে, আবেগে ভাসছে, হাসছে, কখনো বা চোখের পানি ফেলছে। আর বই উঠে যাচ্ছে বেস্ট সেলার তালিকায়।

আরো কিছু আনুষঙ্গিক মজার বিষয় আলোচনায় আনা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে এক সময় 'প্লে বয়'- এর পাশাপাশি একসময় প্লে গার্ল' চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। চলেনি। মেয়েরা এ ধরণের পত্রিকা কেনেনি, বরং কিনেছে সমকামী পুরুষেরা ঢের বেশি। ছেলেরা শুধু কেন বল খেলবে আর মেয়েরা পুতুল - এই শিকল ভাঙ্গার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ধরণের খেলনা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিলো - চলেনি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, আমরা যত আড়াল করার চেষ্টাই করি না কেন, ছেলে মেয়েদের মানসিকতায় পার্থক্য আছে - আর সেটা দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় ছাপ থাকার কারণেই। এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্টে এক মায়ের আর্তিতে। সেই মা পত্রিকায় (নভেম্বর ২, ১৯৯২) তার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন –

> 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার পত্রিকার বিজ্ঞ পাঠকেরা কি বলতে পারবেন কেন একই রকমভাবে বড় করা সত্ত্বেও যতই সময় গড়াচ্ছে আমার দুই জমজ বাচ্চাদের মধ্যকার নারী- পুরুষজনিত পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠছে? কার্পেটের উপর যখন তাদের খেলনাগুলো একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন দেখা যায় ছেলেটা ঠিকি ট্রাক বা বাস হাতে তুলে নিচ্ছে, আর মেয়েটা পুতুল বা টেডি বিয়ার'।

শুধু মানব শিশু নয়, মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি 'ভার্ভেট মাঙ্কি' নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাদের হাতে যদি খেলনা তুলে দেয়া হয়, ছেলে বানরেরা ট্রাক বাস গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বেশি সময় কাটায় আর মেয়ে বানরেরা পুতুল কোলে নিয়ে। মানব সমাজে দেখা গেছে খুব অল্প বয়সেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে খেলনা নিয়ে এক ধরণের পছন্দ তৈরি হয়ে যায়, বাবা মারা সেটা চাপিয়ে দিক বা না দিক। দোকানে নিয়ে গেলে ছেলেরা খেলনা- গাড়ি কিংবা বলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে, আর মেয়েরা পুতুলের প্রতি। এই মানসিকতার পার্থক্যজনিত প্রভাব পড়েছে খেলনার প্রযুক্তি, বাজার এবং বিপননে। যে কেউ টয়সেরাসের মত দোকানে গেলেই ছেলে- মেয়েদের জন্য খেলনার হরেক রকম সম্ভার দেখতে পাবেন। কিন্তু খেলনা গুলো দেখলেই বোঝা যাবে – এগুলো যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বানানো।

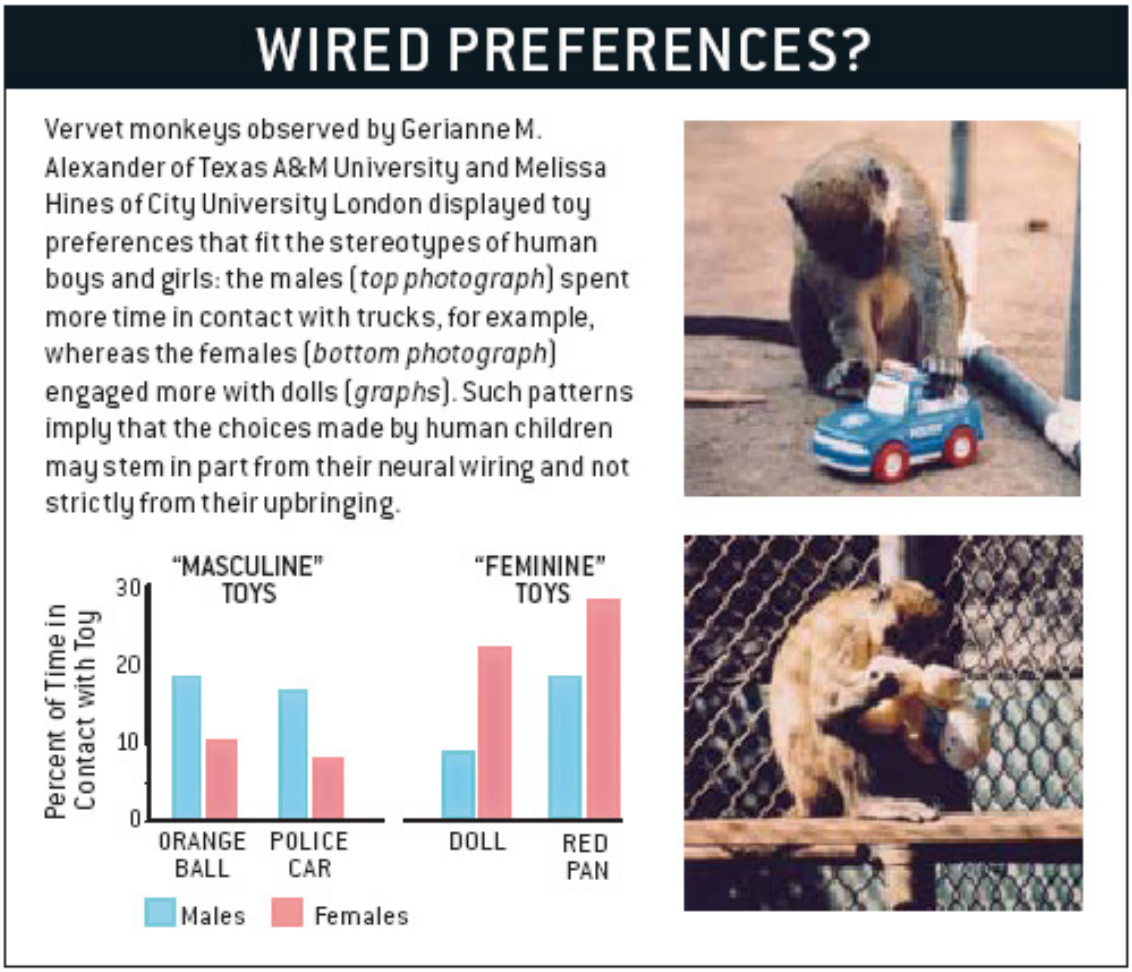

ছবি – বিজ্ঞানীরা ছেলে ভার্ভেট মাঙ্কি নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে খেলনার প্রতি পছন্দের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, যা আমাদের মানব সমাজের ছেলে- মেয়েদের খেলনা নিয়ে 'স্টেরিওটাইপিং'- এর সাথে মিলে যায় (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু শিশু বয়সে নয়, পরিণত বয়সেও ছেলে মেয়েদের মধ্যকার মানসিকতার প্রভেদমুলক পার্থক্য বজায় থাকে পুরোমাত্রায়। পুরুষদের একটা বড় অংশ অর্থ, প্রতিপত্তি এবং যৌনতার প্রতি যেভাবে লালায়িত হয়, মেয়েরা গড়পরতা সেরকম হয় না। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান ছেলে মেয়েদের এই মানসিক পার্থক্যকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে । ডকিন্সের 'সেলফিশ জিন' তত্ত্ব সঠিক হলে, আমাদের দেহ জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে নিতে চাইবে 'জিন সঞ্চালনে'। পুরুষদের জন্য যেহেতু নয় মাস ধরে গর্ভধারনের ঝামেলা নেই, নেই অন্য আনুষঙ্গিক ঝামেলা মেয়েদের যেগুলো পোহাতে হয় গর্ভ ধারনের জন্য, সেহেতু তাদের মধ্যে একটা অংশ থাকেই যারা মনে করে যত বেশি জিন সঞ্চালন করা যাবে ততই বেশি থাকবে ভবিষ্যত প্রজন্ম বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। তাই ইতিহাসে দেখা

যাবে শক্তিশালী পুরুষেরা কিংবা গোত্রাধিপতিরা কিংবা রাজা বাদশাহ রা হেরেম তৈরি করে সুন্দরী স্ত্রী আর উপপত্নি দিয়ে প্রাসাদ ভর্তি করে রাখত। পর্ণগ্রাফির প্রতি আকর্ষণ পুরুষদেরই বেশি থাকে কিংবা পতিতাপল্লিতে পুরুষেরাই যায় - আদিম সেই উদগ্র 'যৌনস্পৃহা' মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই হয়তো।

যৌনতার নির্বাচন তরান্বিত করেছে নারী- পুরুষের পছন্দ অপছন্দ

যৌনতার নির্বাচন শুধু মানব প্রকৃতি গঠনেই সাহায্য করেনি, করেছে নারী- পুরুষের মানস জগৎ তৈরিতে – পলে পলে একটু একটু করে। আসলে সত্যি বলতে কি যৌনতার নির্বাচনকে পুঁজি করে পুরুষ যেমন গড়েছে নারীকে, তামনি নারীও গড়েছে পুরুষের মানসপটকে। এক লৈঙ্গিক বৈশিষ্টগুলোর আবেদন তৈরি করেছে আরেক লিঙ্গের চাহিদা। তৈরি এবং ত্বরান্বিত হয়েছে বিভিন্ন লিংগ- ভিত্তিক নানা পছন্দ অপছন্দ। পুরুষ দির্ঘকাল ধরে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিয়ে গেছে বলে স্বভাবে হয়ে উঠেছে অনেক সহিংস। আবার নারীরাও একটা সময় পুরুষদের এই সহিংসতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, কারণ এ ধরণের পুরুষেরা নিজ নিজ ট্রাইবকে রক্ষা করতে পারত বহিঃশত্রুর হাত থেকে। এ ধরণের সমর দক্ষ পুরুষেরা ছিলো সবার হার্টথ্রব – এরা দিয়েছিলো নিজের এবং পরিবারের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা। এ ধরণের সাহসী পুরুষেরা নিজেদের জিন ছড়াতে পেরেছে অনেক সহজে, আমার মত কাপুরুষদের তুলনায়! ফলে নারীরাও চেয়েছে তার সঙ্গিটি কাপুরুষ না হয়ে সাহসী হোক, হোক বীরপুরুষ! এই ধরণের চাহিদার প্রভাব এখনো সমাজে দৃশ্যমান। ডেট করতে যাওয়ার সময় কোন নারীই চায় না তার সঙ্গি পুরুষটি উচ্চতায় তার চেয়ে খাটো হোক। সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে এ যেন এক অলিখিত নিয়ম, শুধু আমেরিকায় নয়, সব দেশেই! বাংলাদেশে বিয়ে করতে গেলে পাত্রের উচ্চতা বউয়ের উচ্চতার চেয়ে কম দেখা গেলেই আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে গাই- গুই শুরু হয়ে যায় মুহূর্তেই। খাটো স্বামীকে বিয়ে করতে হলে স্ত্রীরও মনোকষ্টের সীমা থাকেনা। হাই হিল জুতো আর তার পরা হয়ে ওঠে না। আসলে দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় প্রভাব মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই এটি ঘটে। লম্বা চওড়া জামাই সবার আদরনীয়, কারণ একটা সময় লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান এই সব পূর্বপুরুষেরা রক্ষা করতে পেরেছিলো স্বীয় গোত্রকে, রক্ষা করেছিলো উত্তরপুরুষের জিনকে - অন্যদের তুলনায় অনেকে ভালভাবে। সেই আদিম মানসপট আধুনিক মেয়েদের মনে রাজত্ব করে তাদের অজান্তেই!

আবার পুরুষদের মানসজগতেও নারীদেহের কিছু বৈশিষ্ট নিয়ে উদগ্র আগ্রহ দেখা যায় সম্ভবতঃ বিবর্তনীয় তথা যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমে মানসপট তৈরি হবার কারণেই। যে কোন দেশের সাহিত্যের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে - নারীর পিনোন্নত স্তন, সুডোল নিতম্ব আর ক্ষীন ক'টিদেশ নিয়ে যুগের পর যুগ কাব্য করেছে পুরুষ – সকল

সংস্কৃতিতেই। কারণ নারীদেহের এই বৈশিষ্টগুলোই সকল পুরুষের কাছে মহার্ঘ্য বস্তু। কিন্তু কেন? কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা বলেন, আদিম সমাজে পুরুষদের কাছে বৃহৎ স্তন এবং নিতম্বের মেয়েরা অধিকতর আদৃত ছিলো প্রাকৃতিক কারণেই। বিপদ সঙ্কুল জঙ্গুলে পরিবেশে মেয়েদের বাচ্চা কোলে নিয়ে পুরুষদের সাথে ঘুরতে হত, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাইয়ে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে হত এলাকায় খাদ্যস্বল্পতা দেখা দিলে। অতি আধুনিক কালের কৃষিবিপ্লবের কথা বাদ দিলে মানুষকে আসলেই শতকরা নব্বই ভাগ সময় যুদ্ধ করতে হয়েছে খাদ্যস্বল্পতার বিরুদ্ধে। যে নারী দীর্ঘদিন খাদ্যস্বল্পতার প্রকোপ এড়িয়ে বুকের দুধ খাইয়ে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, তাদের টিকে গেছে অনেক বেশি হারে। কাজেই কোন নারীর বৃহৎ স্তন পুরুষদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে ভবিষ্যত-প্রজন্মের জন্য 'অফুরন্ত খ্যাদ্যের ভান্ডার' হিসবে। এ এক অদ্ভুত বিভ্রম যেন। এই বিভ্রম দীর্ঘদিন ধরে পুরুষকে করে তুলেছে পৃথুল স্তনের প্রতি আকর্ষিত। তারা লালায়িত হয়েছে, লুব্ধ হয়েছে – এ ধরণের দৈহিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন নারীর সাথে সম্পর্ক করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে জৈবিক তাড়নায়। ঠিক একই ভাবে, বহিঃশত্রু যখন আক্রমণ করেছে তখন যে নারী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দৌড়ে বাঁচতে পেরেছে, তাদের জিন রক্ষা পেয়ছে অনেক সহজে। এই পরিস্থিতির সাথে তাল মিলাতে গিয়ে নারীর কোমড় হয়েছে ক্ষীণ, আর নিতম্ব হয়েছে সুদৃঢ়। আর এ বৈশিষ্টগুলো পুরুষদের কাছে হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আদরনীয়[###]। সুদৃঢ় নিতম্বের প্রতি পুরুষদের আগ্রহের অবশ্য আরো একটি বড় কারণ আছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বিগত পাঁচ মিলিয়ন বছরে মানুষের মস্তিস্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে অবিশ্বস্য দ্রুততায়। ফলে এটি বাচ্চার জন্মের সময় তৈরি করেছে জন্মসংক্রান্ত জটিলতার। এই কিছুদিন আগেও সাড়া পৃথিবীতেই বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে মারা যাওয়া মায়েদের সংখ্যা ছিলো খুবই উদ্বেগজনকভাবে বেশি। আজকের দিনের সিসেক অপারেশন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি এই জটিলতা থেকে নারীকে অনেকটাই মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু আদিম সমাজে তো আর সিসেকশন বলে কিছু ছিলো না। ধারণা করা হয়, সভ্যতার উষালগ্নে ক্ষীণ নিতম্ববিশিষ্ট নারীদের মৃত্যু অনেক বেশি হয়েছে বড় মাথাওয়ালা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে। টিকে থাকতে পেরেছে সুডোল এবং সুদৃঢ় নিতম্ব- বিশিষ্ট মেয়েরাই। কারণ তারা অধিক হারে জন্ম দিতে পেরেছে স্বাস্থ্যবান শিশুর। ফলে দীর্ঘদিনের এই নির্বাচনীয় চাপ তৈরি করেছে নারী দেহের সুদৃঢ় নিতম্বের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক উদগ্র কামনা!

পুরুষের চোখে নারীর দেহগত সৌন্দর্যের ব্যাপারটাকে এতদিন পুরোপুরি 'সাংস্কৃতিক' ব্যাপার বলে মনে করা হলেও সম্প্রতি অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক দেবেন্দ্র সিং তার গবেষণা থেকে দেখিয়েছেন যে, সংস্কৃতি নির্বিশেষে নারীর কোমর এবং নিতম্বের অনুপাত ০.৬ থেকে ০.৮ মধ্যে থাকলে সার্বজনীনভাবে আকর্ষণীয় বলে মনে করা হয়। অধ্যাপক সিং-এর মতে মোটামুটি কোমর : নিতম্ব = ০.৭ - এই অনুপাতই তৈরী করে মেয়েদের 'classic hourglass figure', যা পুরুষদের মনে তৈরী করেছে আদি অকৃত্রিম যৌনবাসনা । সংস্কৃতি নির্বিশেষে এই উপাত্তের পেছনে সত্যতা পাওয়া গেছে বলে দাবী করা হয়। (Singh, D. (2002) Female Mate Value at a Glance: Relationship of Waist-to-Hip Ratio to Health, Fecundity, and Attractiveness. *Neuroendocrinology Letters. Special Issue, 23*, 81-91.)

প্রান্তিক কিছু বিতর্ক

বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মুলতঃ বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভুত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (evolutionary biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের মানসপট নির্মাণে দীর্ঘদিনের এক জটিল পরিকল্পনার ছাপ আছে। আবার বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান বলে যে, জীবদেহের এই 'জটিল পরিকল্পনা' বলে যেটাকে মনে হয় সেটা আসলে ডারউইন বর্ণিত 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'- এর ফলাফল। কাজেই, এই দুই শাখার মিশ্রনে গড়ে উঠা বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপসংহার হচ্ছে – আমাদের জটিল মানসপটও উদ্ভুত হয়েছে দীর্ঘদিনের পথ- পরিক্রমায় - প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবেই। এটি দেখানোই এই প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

আমি এ লেখাটিতে বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান এবং এর থেকে পাওয়া আধুনিক গবেষণালব্ধ ফলফল নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। কিছু কিছু ব্যাপার বিতর্কিত মনে হতে পারে, মনে হতে পারে এখনো 'প্রমাণিত' কোন বিষয় নয়। আমি তারপরও চেষ্টা করেছি বৈজ্ঞানিক সাময়ীকি এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের (যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ) লেখা থেকে সর্বাধুনিক তথ্যগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠকদের সামনে হাজির করতে। প্রান্তিক গবেষণালব্ধ জিনিস প্রবন্ধাকারে সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবে হাজির করলে একটা ভয় সবসময়ই থাকে যে, পরবর্তীতে অনেক কিছুই মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। তারপরও এই প্রান্তিক জ্ঞানগুলো আমাদের জন্য জরুরী। অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তার 'হাও মাইন্ড ওয়ার্ক্স' বইয়ের ভুমিকায় যেমনিভাবে বলেছিলেন - 'Every idea in the book may turn out to be wrong, but that would be progress, because our old ideas were too vapid to be wrong!'; আমিও সেকথাই বলার চেষ্টা করব। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন শাখা। নতুন জিনিস নিয়ে গবেষনার ক্ষেত্রে - এর কিছু প্রান্তিক অনুমান যদি ভুলও হয়, সেটই হবে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের জন্য 'প্রগ্রেস'। আর সেই সঙ্ঘাত সংঘর্ষ থেকেই ঘটবে হবে নতুন অজানা জ্ঞানের উত্তোরণ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়। এ লেখার কিছু উপসংহার নারীবাদীদের জন্য 'অপমানজনক' বলে প্রতিভাত হতে পারে। মনে হতে পারে 'স্টাটাস কো' বজায় রাখার 'পুরুষতান্ত্রিক' অপচেষ্টা, কিংবা 'ব্যক টু কিচেন' আর্গুমেন্ট । বিষয়টা পরিস্কার করা যাক। আমি আমার প্রবন্ধে দেখিয়েছি যে পুরুষেরা অনাদিকাল থেকেই অসংখ্য যুদ্ধ- বিগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজেদের নিয়ে যাওয়ায় তারা মন মানসিকতায় অনেক প্রতিযোগিতামূলক এবং সহিংস হয়ে উঠেছে। এর স্বপক্ষে বেশ কিছু উদাহরণ আমি

আমার এই প্রবন্ধে হাজির করেছি। আর মেয়ারা ঘর- দোর সামলাতে আর বাচ্চা মানুষ করার পেছনে তাদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্র অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে এর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, মেয়েরা ঘরে থাকুক, কেবল বাচ্চা মানুষ করুক, আর ছেলেরা বাইরে কাজ করুক - এটই ন্যাচারাল - এভাবে কেউ দেখা শুরু করলে পুরো বিষয়টিকে কিন্তু ভুল উপস্থাপনার দিকে নিয়ে যাবে। প্রথমতঃ বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে কেন সমাজ বা মানবপ্রকৃতির বড় একটা অংশ কোন একটা নির্দিষ্ট ছকে আবদ্ধ থাকে সেটা ব্যাখ্যা করা, সমাজ কিরকম হওয়া 'উচিৎ' তা নয়। আরো পরিস্কার করে বললে - 'Evolutionary psychology describes what human nature is like - it does not prescribe what humans should do'। আর তাছাড়া কোন কিছু 'ন্যাচারাল' বা প্রাকৃতিক মনে হলে সেটা সমাজেও আইন করে প্রয়োগ করতে হবে বলে যদি কেউ ভেবে থাকেন, সেটা কিন্তু ভুল হবে। এটা এক ধরণের হেত্বাভাস, এর নাম, ‘ন্যাচারিলিস্টিক ফ্যালাসি’। প্রকৃতিতে মারামারি কাটাকাটি আছে। সিংহের মত এমন প্রানীও প্রকৃতিতে আছে যারা নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলে। কাজেই এগুলো তাদের জন্য ‘প্রাকৃতিক’। কিন্তু তা বলে এই নয় সে সমস্ত ‘প্রাকৃতিক’ আইনগুলো মানব সমাজেও প্রয়োগ করতে হবে। বিবর্তননীয় মনোবদ্যা থেকে পাওয়া প্রকল্প থেকে আমরা বলতে পারি কেন পুরুষের মন প্রতিযোগিতামূলক হয়ে বেড়ে উঠেছে, কিংবা অনুমান করতে পারি যে পুরুষদের একাংশ কেন মেয়েদের চেয়ে স্বভাবে বহুগামী, কিন্তু তা কোনভাবেই যুদ্ধ হানাহানিকে ন্যায্যতা প্রদান করে না কিংবা বহুগামীত্বকে আইন করে দিতে বলে না। মানুষ নিজ প্রয়োজনেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন করে, সামাজিক ভাবে কিংবা ধর্মীয়ভাবে বিয়ে করে, বাচ্চা না নেয়ার জন্য কিংবা কম নেওয়ার জন্য পরিবার- পরিকল্পনা করে, কিংবা একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল হয় – যেগুলোর অনেক কিছুই প্রকৃতিতে বিরল। ম্যাট রীডলি তার 'রেড কুইন' বইয়ে বলেন -

> It is terribly tempting, as human beings, to embrace such as evolutionary scenario because, it 'justifies' a prejudice in favor of male philandering, or reject it because it 'undermines' the presence for sexual equality. But it does neither. It says, absolutely nothing about what is right or wrong. I am trying to describe the nature of humans, NOT to prescribe their morality. That something is natural, does not make it right. Murder is 'natural' in the sense that our ape relatives commit it regularly, as apparently did our human ancestors too. Prejudice, hate, violence, cruelty - all are more or less part of our nature, and all can be effectively countered by the right kind of nature. Nature is not inflexible, but malleable.

আরেকটি বিষয়ও কিন্তু মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে, যারা মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখতে চান। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় হান্টার ছিলো, আর

মেয়েরা গ্যাদারার, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় গ্যাদারার ছিলো, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না, বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না? না তা কখনোই নয়। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পরতা স্পেসিফিক বা স্পেশাল কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণতঃ) বেশি দক্ষ হয়, মেয়েরা সামগ্রিকভাবে মাল্টিটাস্কিং- এ। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রন। এখানে সফল হতে 'স্পেসিফিক' দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে 'মাল্টিটাসকিং'ও। কাজেই কোনভাবেই 'ব্যাক টু দ্য কিচেন' আর্গুমেন্ট গ্রহনযোগ্য নয়। আসলে নারী- অধিকারকে বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর খুব বড় কোন যুক্তি নেই। জীববিজ্ঞানী হেলেনা ক্রনিন যেমন নিজেকে এখন 'ডারউইনিয়ান ফেফিমিনিস্ট' বলেন, সেরকম কিছু একটা টার্ম এখন অন্যান্য নারীবাদীদের জন্য খুঁজে নেয়া দরকার।

তবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে অনেকের মধ্যে যে ভীতি আছে তাকে একেবারে অমূলক বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। ডারউইনবাদকে সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা অতীতে সুখকর হয়নি আমাদের জন্য। সামাজিক ডারউইনবাদ, ইউজিনিক্স প্রভৃতি অপবিজ্ঞানের চর্চা গণমানুষের মনে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ভিক্টোরিয়ান যুগে সামাজিক ডারউইনবাদের (social darwinism) উদ্ভব ঘটান হার্বার্ট স্পেনসার নামের এক দার্শনিক, যা ডারউইন প্রদত্ত্ব বিবর্তন তত্ত্ব থেকে একেবারেই আলাদা। স্পেন্সর ডারউইন কথিত জীবন সংগ্রাম (struggle for life) কে বিকৃত করে তিনি 'যোগ্যতমের বিজয়' (survival of fittest)[§§§] শব্দগুচ্ছ সামাজিক জীবনে ব্যবহার করে বিবর্তনে একটি অপলাপমূলক ধারণার আমদানী করেন। স্পেনসারের দর্শনের মূল নির্যাসটি ছিল – 'মাইট ইজ রাইট। তিনি প্রচারণা চালান যে, গরীবদের উপর ধনীদের নিরন্তর শোষণ কিংবা শক্তিহীনদের উপর শক্তিমানদের দর্প এগুলো নিতান্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই এগুলো ঘটছে, তাই এগুলোর সামাজিক প্রয়োগও যৌক্তিক। এ ধরনের বিভ্রান্তকারী দর্শনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে বিভিন্ন শাষকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে ঔপনিবেশিকতাবাদ, জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্যকে বৈধতা দান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিভিন্ন সময়। হিটলার তার নাৎসীবাদের সমর্থনে ইউজেনিক্স নাম দিয়ে একে ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে আমেরিকার ২৪ টি রাষ্ট্রে 'বন্ধ্যাকরণ আইন' পাশ করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল জনপুঞ্জে 'অনাকাঙ্খিত' এবং 'অনুপযুক্ত' দুর্বল পিতামাতার জিনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। অর্থাৎ 'সামাজিকভাবে ডারউইনবাদের প্রয়োগ'-এর মাধ্যমে 'যোগ্যতমের বিজয়' পৃথিবীতে নানা ধরণের নৈরাজ্যজনক

[§§§] ডারউইন কখনওই তার তত্ত্বে এধরনের 'যোগ্যতমের বিজয়'-এর কথা বলেন নি, কিংবা তার প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে কখনই সামাজিকজীবনে প্রয়োগ করার কথা ভাবেননি। কাজেই এ ধরনের বর্ণবাদী তত্ত্বের সাথে ডারউইন বা তত্ত্বকে জড়ানো নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ প্রসঙ্গে বন্যা আহমেদের 'বিবর্তনের পথ ধরে' (অবসর, ২০০৭) বইটির একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রতিক্রিয়শীলতার জন্ম দিয়েছিল, আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, যা থেকে অনেকে এখনও মুক্তি পায় নি। সেই সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা ভাবলে, বলতেই হবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে তাদের যুক্তিগুলো ভ্রান্ত, কিন্তু তাদের ভীতিটাকে ঐতিহাসিকতার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। তাদের ভীতির অতীত- বাস্তবতাটুকু স্বীকার করে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে। কিন্তু এ কথাও আমাদের বলে দিতে হবে যে, আজকের বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই তাদের গবেষণা করছেন। তারা খুব ভালভাবেই নাৎসী ইউজিনিক্স কিংবা স্পেন্সরের সামাজিক ডারউইনবাদ থেকে নিজেদের কাজকে আলাদা করতে পেরেছেন। নাৎসীরা ডারউইনবাদকে ভুলভাবে প্রয়োগ করে ইউজিনিক্স নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করেছিল বলেই ভবিষ্যতে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোন থেকে আর কখনোই কোন কিছু বিশ্লেষণ করা যাবে না – এই দিব্যি কেউ দিয়ে যায়নি।

আসলে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান জৈববৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজের প্যাটার্ণ অনুসন্ধান করে, কিন্তু সামাজিক জীবনে এর প্রয়োগের ‘ঔচিত্য’নিয়ে কখনোই মাথা ঘামায় না। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা আগেকার সময়ের ‘সামাজিক ডারউইনিজম’ সংক্রান্ত জুজুর ভয় কাটিয়ে উঠে ডারউইনীয় বিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বিশেষতঃ গত শেষ দশকে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নিয়ে খুব ভাল কিছু কাজ হয়েছে। প্রতি বছরই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন গবেষণার আলোকে ফলাফল হাজির করেছেন এবং এর প্রেক্ষিতে শাখাটি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠছে। সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলে যেভাবে এতদিন সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রকৃত বিজ্ঞানকে কৃত্রিম একটা দেওয়াল দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিলো, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান নামে নতুন শাখার আগমন এই কৃত্রিম দেওয়ালকে সরিয়ে দিতে সফল হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আজ বলছেন, ডারউইনীয় মডেলকে গোনায় ধরে কাজ শুরু করায় বিবর্তনীয় মনোবিদ্যা হয়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানকে বিশ্লেষণের প্রথম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান – “Evolutionary Psychology is the first natural science of psychology”। অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর চেয়ে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে ভবিষ্যদ্বানী করা করতে পেরেছেন গবেষকেরা। এটি নিঃসন্দেহ - একটা সময় পর ‘বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান’ বলে আলাদা কিছু আর থকবে না। পুরো শাখাটিকে স্রেফ **মনোবিজ্ঞান** নামেই অভিহিত করা হবে। সেই দিন হয়ত খুব বেশি দূরে নয়।

তথ্যসূত্র

The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Matt Ridley, Penguin, 1995.

The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science, Norman Doidge, 2007

The Genie in Your Genes, Dawson Church, Epigenetic Medicine and the New Biology of Intention, Elite Books, 2007

Sociobiology: The New Synthesis, Edward O. Wilson, Twenty-fifth Anniversary Edition, Belknap Press, 2000

On Human Nature, Edward O. Wilson, Harvard University Press; Revised Edition edition (October 18, 2004)

The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, Steven Pinker, 2003

Biology as Ideology: The Doctrine of DNA, Richard C. Lewontin, Harper Perennial, 1993

How the Mind Works, Steven Pinker, W.W. Norton & Co., 1999

Not in Our Genes, Richard Lewontin, Steven Rose, Leon J. Kamin, Pantheon, 1985

Dialectical Biologist, Richard Levins, Richard C. Lewontin, Harvard University Press 1985

The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology, Robert Wright, Vintage, 1995.

The Mismeasure of Man, Stephen Jay Gould, W.W. Norton & Co., 1996

Determining Nature vs. Nurture; Douglas Steinberg, October/November 2006; Scientific American Mind.

Trends In Social Science : The New Social Darwinists, John Horgan, Scientific American October 1995.

DNA Is Not Destiny, Ethan Watters, Discover Magazine(November 2006 issue)

Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think: Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers, Alan Grafen & Mark Ridley (Editor), Oxford University Press, USA, May 1, 2006.

The Agile Gene: How Nature Turns on Nurture, Matt Ridley, Harper Perennial, 2004.

The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Matt Ridley, Harper Perennial, 2003

He Thinks, She Thinks, Gender differences show up in the brain, Linda Marsa, Brain special issue, Discover, published online July 5, 2007

অপার্থিব, মানব প্রকৃতি কি জন্মগত না পরিবেশগত?, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৮

ফরিদ আহমেদ, মার্গারেট মিড নৃতত্ত্বের রাণী, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৮